দৃষ্টি
ও
ব্যাপ্তি
— পৃঃ ১৫

স্বস্তিকা

দাম : দশ টাকা

বাংলার দুর্দিন :
ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ
— পৃ : ২৯

৬৮ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।। ৯ ফাল্গুন - ১৪২২।। যুগাব্দ ৫১১৭।। website : www.eswastika.com ।।

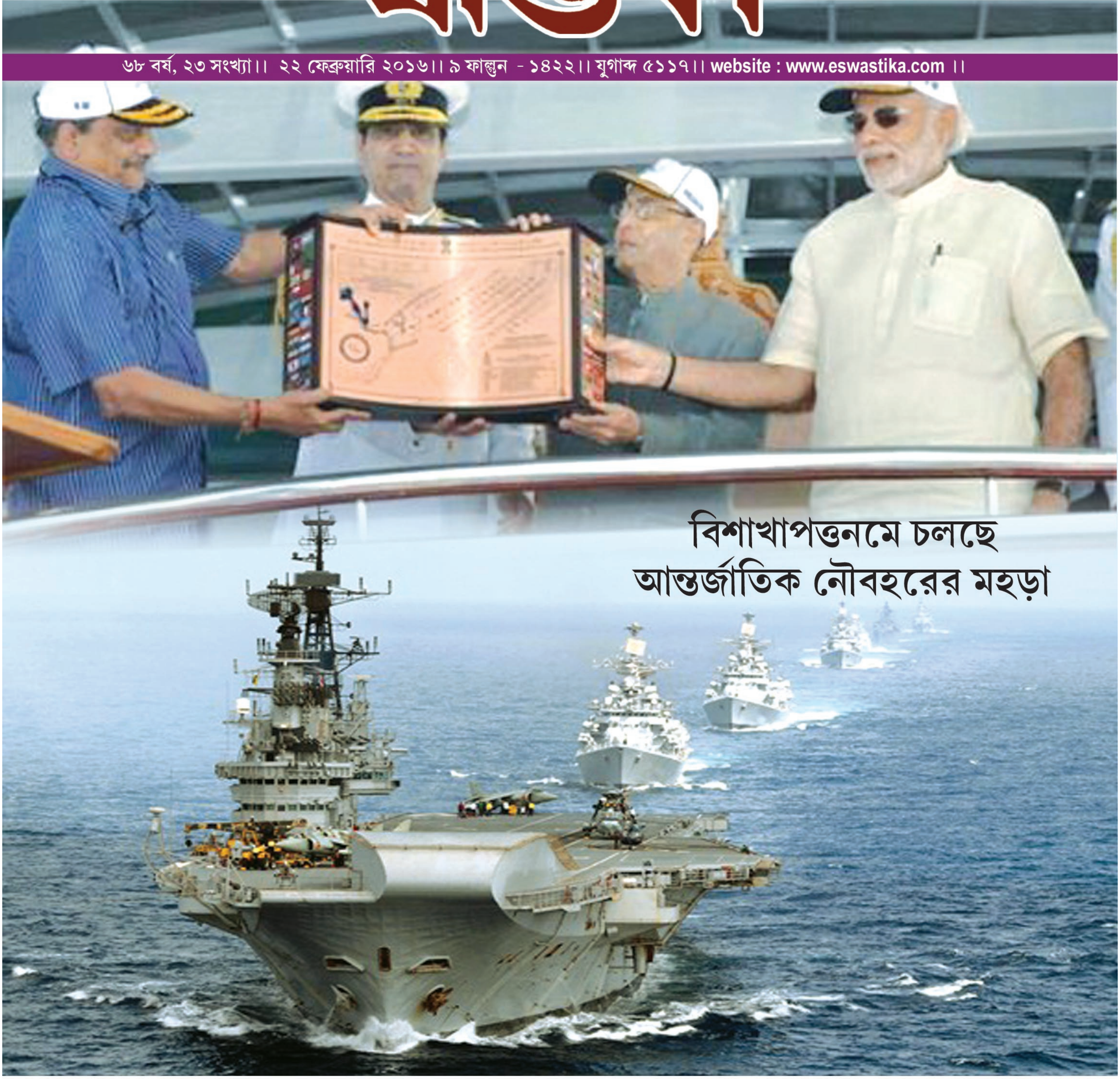

বিশাখাপত্তনমে চলছে আন্তর্জাতিক নৌবহরের মহড়া

হিন্দুত্ব কখনও অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দেয় না : ভাইয়াজী যোশী

— পৃঃ ১২

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ৯ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২২ ফেব্রুয়ারি - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদীকে শহিদ বানাতে চাইছে কমিউনিস্টরা □ গূঢ়পুরুষ □ ৯

বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নৌবহরের মহড়া ভারতের নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবে

□ মে: জে: কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অব:) □ ১০

সাক্ষাৎকার : হিন্দুত্ব কখনও অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দেয় না : ভাইয়াজী যোশী □ ১২

দৃষ্টি ও ব্যাপ্তি □ সুরেশ যোশী □ ১৫

খোলা চিঠি : চাষার ব্যাটার দিদি-শরণ □ সুন্দর মৌলিক □ ১৮

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ২১

অপ্রতিরোধ্য অম্বা □ সুতপা ভড় □ ২২

অন্তর্লীন মারণ রোগটিকে বুঝতে হবে

□ জে এল রাজপুত □ ২৭

বাঙালির দুর্দিন— ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ

□ প্রবাল চক্রবর্তী □ ২৯

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৮** □ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **চিত্রকথা : ৪১** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

স্টার্ট আপ ইণ্ডিয়া

নতুন ভারত গঠনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এক অভিনব উদ্যোগ ‘স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া’ গ্রহণ করেছেন। এই প্রথম এদেশে সরকারিভাবে এমন ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। এই বিষয়টি নিয়েই এবারে আলোচনা করেছেন দিব্যজ্যোতি চৌধুরী ও অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

।। দাম একই থাকছে ১০ টাকা।।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জে এন ইউ : বাক্-স্বাধীনতার নামে দেশদ্রোহিতা নয়

দিল্লীর এক হাসপাতালে যখন উনিশ হাজার ফুট উঁচুতে সিয়াচেনে দেশ রক্ষায় নিয়োজিত বরফে চাপা পড়িয়া 'কোমা'য় আচ্ছন্ন হনুমান থাপ্পা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিতেছেন, তখন অনতিদূরে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে (জে এন ইউ) ভারত বিরোধী ধ্বনি দেওয়া হইতেছে। সংসদ হামলার অভিযোগে আফজল গুরুর ফাঁসির দিনটিকে স্মরণীয় রাখিতে গত ৯ ফেব্রুয়ারি জে এন ইউ-তে ছাত্রদের উদ্যোগে এক সমাবেশের আয়োজন করা হইয়াছিল। সেই সমাবেশে আফজল গুরুর ফাঁসির বিরোধিতা করা হয়। গুরু ও মকবুল ভাটকে শহিদ আখ্যা দিয়া এই ঘটনাকে 'জুডিশিয়াল কিলিং' বলিয়া অভিহিত করা হয়। লস্কর-ই-তৈবা এবং জয়েস মুহম্মদ নামক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত জেহাদিরা ভারতের সংসদ ভবনকে উড়াইয়া দিয়া মন্ত্রিসভা এবং সংসদের সব সদস্যকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র রচনা করিয়াছিল। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বরের এই হামলার সময় প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য, বিরোধী নেত্রী সোনিয়া গান্ধী-সহ অনেক প্রবীণ নেতা সংসদ ভবনে উপস্থিত ছিলেন। এই ষড়যন্ত্রের মূল মস্তিষ্ক হিসাবে আফজল গুরুকে চিহ্নিত করা হয় এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তারের পর ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তর অতিক্রমের শেষে সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদন ক্রমেই ফাঁসি কার্যকর করা হইয়াছিল। দেশের সামগ্রিক স্বার্থেই তাই ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি কানহাইয়া কুমারকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং ঘটনার সহিত যুক্ত অন্যান্যদেরও ধরপাকড়ের চেষ্টা চালানো হইতেছে।

যাঁহারা এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইতেছেন তাঁহারা শুধু দেশ এবং জাতির স্বার্থেরই বিরোধিতা করিতেছেন না, দেশের সর্বোচ্চ আইন ব্যবস্থারও বিরোধিতা করিতেছেন। ভারতকে ধ্বংস করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অপরাধীকে যাঁহারা শহিদ আখ্যা দেন তাঁহারাও যে দেশদ্রোহমূলক অপরাধে সমান দোষী—এই জন্য আর অন্য কোনো সাক্ষ্যের প্রয়োজন পড়িবে কি? সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি পুলিশের পদক্ষেপকে জরুরি অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াছেন। কিন্তু কমরেড ইয়েচুরি, বেজিং বিশ্ববিদ্যালয়ে এইরকম কোনো ঘটনা ঘটিলে কেমন হইত সরকারি পদক্ষেপ? তিয়েন-আন-মেন স্কোয়ারের কথা মনে পড়ে? পুলিশ নয়—সেনাবাহিনী মার্চ করিত। কমিউনিস্টদের জাতীয়তা-বিরোধী চরিত্র ইতিহাসের কলঙ্ক। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার হিসাবে পাকিস্তান প্রস্তাবের তাহারা সমর্থন জানাইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষকে একটি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দানে তাহাদের আপত্তি। এই দেশ কতকগুলো জাতিসত্তার সম্মিলন মাত্র—এই অবস্থান হইতে তাহারা কি সরিয়া আসিয়াছে? রাইট টু সেসেশনের নামে প্রদেশগুলি যদি আলাদা হইবার দাবি তোলে তাহাতে তাঁহারা খুশিই হইবে। জম্মু-কাশ্মীরের সম্পর্কে সংবিধানের ৩৭০ ধারা সম্পর্কে কমিউনিস্টদের অবস্থান তাই অস্পষ্ট।

কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধীও কমিউনিস্টদের পাশে দাঁড়াইয়াছেন। কানহাইয়া কুমারের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সামিল হইয়াছেন। এই গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গে তিনি আর এস এস-বিজেপির বিরুদ্ধে জোর করিয়া নিজস্ব আদর্শ প্রয়োগ করিবার অভিযোগ তুলিয়াছেন। প্রশ্ন হইল, দেশের সংসদে সন্ত্রাসবাদী হামলার জন্য দোষী-সাব্যস্ত আফজল গুরুর মহিমা প্রচারকারী এবং কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গ দিয়া রাহুল গান্ধী কোন দেশভক্তির পরিচয় দিতেছেন? কংগ্রেসের জন্য এটাই কি দেশভক্তির পরিভাষা? বাক্-স্বাধীনতার আড়ালে তাহারা কি দেশবিরোধী শক্তিকে ছাড় দিয়া পুনরায় দেশভাগ করিতে চান?

স্মরণ রাখিতে হইবে, বাক্-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র কোনো কিছুই জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে নয়। দেশের স্বাভিমানকে আঘাত করিয়া কেহ নাগরিক অধিকার দাবি করিতে পারে না। সংবিধানে বাক্-স্বাধীনতার সঙ্গে তাহার সীমানাও নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই বাক্-স্বাধীনতার নামে যাঁহারা দেশদ্রোহিতা ছড়াইতেছে তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুর মতো ব্যবহারই দরকার।

সুভাষিতম্

শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ লোকে শীলবতাং ভবেৎ।।

চরিত্রবলেই ত্রিলোক বিজয় করা যায়— এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং চরিত্রবান ব্যক্তির পক্ষে এই সংসারে কিছুই অসাধ্য নয়।

জে এন ইউ-তে রাষ্ট্রদ্রোহী কাজকর্মের তীব্র প্রতিবাদ বিদ্যার্থী পরিষদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। 'অসহিষ্ণুতা'র আড়ালে এতদিন ভারত- বিরোধীদের খেলাটা ভালোই চলছিল, জে এন ইউ-কাণ্ড তাদের মুখোশ খুলে মুখটা দেখিয়ে দিল। দেখিয়ে দিল এই 'অসহিষ্ণুতা'র নামে গেল গেল রব, পুরস্কার ফেরত দেওয়ার ফিকির, রোহিত ভেমুলা কাণ্ডে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ— সবই আসলে ভারতবর্ষকে বিশ্বের সামনে অপমান করবার জন্য। ২০০১ সালে সংসদ ভবন হামলার জন্য ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সালে ফাঁসি হয় যে আফজল গুরুর এবং ১৯৮৪ সালে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টের সহ-প্রতিষ্ঠাতা যে মকবুল ভাটকে দেশবিরোধী কাজকর্মের জন্য ফাঁসিতে ঝোলানো হয়, তাদের 'শহীদ' সাজানো দেশবিরোধিতারই নামান্তর। গত ৯ ফেব্রুয়ারি আফজল গুরুর ফাঁসির তৃতীয় বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ঠিক এই কাণ্ডটাই করেছিল জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বামপন্থী ছাত্র।

জে এন ইউ বরাবরই কমিউনিস্ট মানসিকতার ছাত্র-আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধ। ভারত-বিরোধী কাজকর্ম সেখানে যে কোনোকালে হয়নি তা নয়। কিন্তু এভাবে খুল্লামখুল্লা জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের সমর্থনে সভা প্রায় বিরল ঘটনা। এখন জে এন ইউ ক্যাম্পাসে দেশের বৃহত্তম ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র-সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। গত নির্বাচনে ছাত্র-সংসদের সহ-সম্পাদকের পদও দখল করে তারা। সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন সৌরভ কুমার শর্মা। সুতরাং তখনই প্রমাদ গুণেছিল বামপন্থীরা। কিন্তু এ বি ভি পি-কে আটকাতে সরাসরি রাষ্ট্রদ্রোহিতায় মদত দেবে তারা, এটা অকল্পনীয় ছিল।

বামপন্থীদের বদ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়, যখন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে তারা এই সভার অনুমতি প্রার্থনা করে তখন 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এর দাবি করেছিল। এবং জে এন ইউ জুড়ে পোস্টার লাগানো হয়েছিল 'কাশ্মীরের জীবিকার ইতিহাস এবং এর বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের ওপর ছবির প্রদর্শনী ও শিল্পকলা'। পোস্টারে 'কাশ্মীরী জনগণের স্বশাসনের অধিকারের জন্য লড়াই'-মার্কা কথাবার্তা দেখে বিদ্যার্থী পরিষদের কর্মীদের সন্দেহ হয়। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে এই অনুষ্ঠানের আয়োজকদের কু-মতলব বুঝতে পেরে অনুষ্ঠান বাতিল করে দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম জগদীশ কুমার স্পষ্ট জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি বজায় ও বিশ্ববিদ্যালয়কে শান্ত রাখা উপাচার্য হিসেবে তাঁর কর্তব্য। এবং আয়োজকরা 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান'-এর নামে দেশের পক্ষে অবমাননাকর কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করলে তা বাতিল করাও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এর পরেও বামপন্থীরা জে এন ইউ-এর সবরমতী হস্টেল থেকে গঙ্গা ধাবা পর্যন্ত মিছিল করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অশান্ত করার চেষ্টা করে ১০ ফেব্রুয়ারি। ফেসবুক, টুইটারে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে 'কাশ্মীরে আজাদির জন্য সংগ্রাম চলছে চলবে', 'ভারত যতদিন শোষণ চালাচ্ছে, ততদিন এই লড়াই চলবে' ইত্যাদি। সবরমতী হস্টেলের সামনে বামপন্থীদের বিক্ষোভেও এই ধরনের দেশ-বিরোধী শ্লোগান দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বসন্তকুঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-সংসদের সভাপতি তথা সিপিআই-এর ছাত্র-সংগঠন এ আই এস এফের নেতা কানহাইয়া কুমারকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকার সময়োচিত ও যথাযথ কড়া মনোভাব নিয়েছে। ভারতবর্ষের কোথাও রাষ্ট্রদ্রোহী কর্মকাণ্ড বরদাস্ত হবে না বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা তাদের মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর এতে কংগ্রেস, সিপিএম, আম-আদমি পার্টির মতো রাজনৈতিক দলগুলি এবং একশ্রেণীর সংবাদমাধ্যমের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। লস্কর জঙ্গি হাফিজ সঈদ টুইট করে জে এন ইউ-এর রাষ্ট্রদ্রোহী ছাত্রদের প্রতি তার সহমর্মিতা জানিয়ে তাদের পাশে পাক-জনগণকে দাঁড়াতে উপদেশ দিলেও, এই টুইট-টিকে ভুয়ো বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছে কিছু সংবাদমাধ্যম। তাদের সঙ্গে হাফিজের 'হটলাইন' যোগ রয়েছে কিনা এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই প্রশ্নও উঠছে। হাফিজের সেই টুইটার অ্যাকাউন্টটি পরে মুছে যাওয়ায় এমন প্রশ্নও উঠছে, কং-বাম-আপের মতো তার বন্ধু রাজনৈতিক দলগুলি এতে বিপাকে পড়ছে বুঝেই কি টুইট প্রত্যাহার হাফিজের? সোস্যাল মিডিয়ায় এমন 'ভিডিও ক্লিপ'ও ছড়ানো হচ্ছে যে এবিভিপি সমর্থকেরা নাকি 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' স্লোগান দিচ্ছে। কিন্তু যে আহাম্মকরা এই নোংরামিটা করছে, তারা খেয়ালও করছে না ঘটনার সূত্রপাত আফজল গুরু ও মকবুল ভাট-এর প্রতি বামপন্থীদের 'শ্রদ্ধাবাসর'কে ঘিরে। যে আফজল ও মকবুলের পরিচিতি পাক-সমর্থনে ভারতের মাটিতে দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ফাঁসি যাওয়ায়। আর এই রাষ্ট্রদ্রোহীদের 'শ্রদ্ধাবাসর'-এর প্রতিবাদ করেছে একমাত্র এবিভিপি-ই, আর বাকিরা তাদের 'শ্রদ্ধা' এদের প্রতি নিবেদনে জে এন ইউ-তে 'বাসর' বসানোর চেষ্টা করেছিল। সুতরাং এবিভিপি-র প্রতি এধরনের অপপ্রচারে 'আসতে কন কত্তা, নইলে ঘোড়ায় হাসবো।'

ইশরাত জাহান কাণ্ডে কংগ্রেসের চক্রান্ত ফাঁস

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে নানান মামলা ও নিত্য নতুন অসত্য- অপ্রমাণিত অভিযোগের বন্যা দেখে তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানী মন্তব্য করেছিলেন 'স্বাধীন ভারতে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে কখনও এত দীর্ঘদিন ধরে একটি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এমন হয়রানির শিকার হতে হয়নি।' কথাটির সত্যতা আবার প্রমাণিত হলো সম্প্রতি আমেরিকায় দেওয়া জঙ্গি রিচার্ড হেডলির জবানবন্দীতে। হেডলি জানিয়েছে, ইশরাত জাহান লস্কর-ই- তৈবার আত্মঘাতী জঙ্গি হিসেবেই ভারতে ঢুকেছিল। তার উদ্দেশ্যই ছিল বৃহত্তর চক্রান্তের অংশ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকে খুন করা। হেডলির স্বীকারোক্তি আরও মান্যতা পেয়েছে সম্প্রতি ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর পূর্বতন স্পেশাল ডাইরেক্টর রাজেন্দ্র কুমারের বয়ানে। শ্রী কুমার জানিয়েছেন, তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার মোদীকে হেনস্থা করতে ইশরাতের মৃত্যুকে সাজানো বলে চালাবার চক্রান্তে

লিপ্ত হয়েছিল। মোদীকে হত্যার নির্দেশ এসেছিল সরাসরি পাকিস্তান থেকে। সংবাদে প্রকাশ, ইশরাতের মৃত্যুর পরে পরেই লাহোরের কাগজ 'গাজওয়া টাইমস' জানায়— ইশরাত জাহান, জাভেদ শেখ-সহ তার সঙ্গীরা সকলেই লস্কর-ই-তৈবার সদস্য'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওই ঘটনায় তৎকালীন গুজরাটের ডিআইজি ডিজি বানজারাকে দীর্ঘদিন জেলে ভরে রাখা হয়। শ্রী কুমার আরও জানান, আই বি-র হাতে পর্যাপ্ত তথ্য প্রমাণ তখনও পর্যন্ত ছিল বলেই তিনি মনে করেন।

ওয়াকিবহল মহলের সূত্র অনুযায়ী কংগ্রেস সভানেত্রীর ডান হাত আহমেদ প্যাটেলের দিকেই রয়েছে এই ঘৃণ্য চক্রান্তের তীর। ইউপিএ জমানাতেই রাজেন্দ্র কুমারের বিরুদ্ধে সিবিআই মামলা করার অনুমতি চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে চিঠি দিয়েছিল। সবই যে ইউপিএ সরকারের অন্তরাত্মার ইচ্ছায় হয়েছিল এমনটা শোনা যাচ্ছে।

বিশ্ব উষ্ণায়ণের জের ১০ হাজার বছর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ মাত্রাতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের ফলে উদ্ভূত পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়ণের জের দশ হাজার বছর ধরে চলবে বলে সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক তাপমাত্রা তুষার ক্ষেত্রে এবং হিমবাহগুলিকে গলিয়ে দেওয়ার ফলে ভবিষ্যতে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে বসবাসরত ১৩ কোটি মানুষ গৃহহারা হবে। তুষার যুগের শেষে মহাপ্লাবনের যে ভয়াবহতা সারা বিশ্বে দেখা দিয়েছিল এ যুগে গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর ভয়াবহতা তার থেকেও আরোও বেশি বিপজ্জনক হবে বলে সতর্কবাণী শুনিয়ে রেখেছেন বোস্টন কলেজের জেরেমি শাকুন। এ ব্যাপারে অনুসন্ধানের জন্য একটি আন্তর্জাতিক গবেষক দল হিমবাহের গলে যাওয়া, সমুদ্রের জলস্তরের উচ্চতা, উপকূলবর্তী অঞ্চলের বন্যার ভিত্তিতে একটি স্টেট অফ দি আর্ট ক্লাইমেট এবং আইস শিট মডেল তৈরি করেছেন। তারা একটি সম্ভাব্য হিসাব তৈরি করেছেন যাতে ১২৮০ বিলিয়ন টন কার্বন আগামী কয়েক শ' বছরে জমা হবে যা প্রকৃত পরিমাণের থেকে অনেক কম।

গবেষকরা আশঙ্কা করছেন যে এইভাবে কার্বনের নির্গমন বিশ্বের গড় তাপমাত্রার প্রান্ত সীমার থেকেও ২ ডিগ্রি বেশি হবে। এজন্য হিমবাহ এবং সুবিশাল বরফের খণ্ডগুলি যেগুলি গ্রিনল্যান্ড এবং অ্যান্টার্কটিকায় জমা হয়ে আছে, একসঙ্গে গলে গিয়ে প্রায় ২৫ মিটার সমুদ্রজলস্তরের উচ্চতাকে বাড়িয়ে দেবে। গবেষকগণ বিগত ১০ হাজার বছর থেকে তুষার যুগের চূড়ান্ত পর্যন্ত প্রাকৃতিক ভাবে কার্বনের নির্গমন, তাপমাত্রা বৃদ্ধি, হিমবাহের গলন, সমুদ্র জলস্তরের উচ্চতা সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। সৃষ্টির আদিকালে এই আবহাওয়ার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৩০ মিটার সমুদ্রজলস্তরের উচ্চতা কমে যেতে ১০ হাজার বছর সময় নেয় যা একটি স্থিতিশীল আবহমণ্ডল তৈরি করতে সক্ষম যাতে মনুষ্য সভ্যতা বিকশিত হতে পারে।

এই তথ্যগুলি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে কারণ এইসব তথ্যাদির মাধ্যমেই হাজার হাজার বছর ব্যাপী আবহাওয়ার পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যাবে বলে গবেষকরা জানিয়েছেন। জার্নাল অফ নেচার ক্লাইমেট চেঞ্জ পত্রিকায় তথ্যগুলি বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বই প্রদান করবে কেন্দ্রীয় সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বের বদলে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা প্রদান করতে চলেছে, কংগ্রেসের এই অপপ্রচার উড়িয়ে দিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রামমাধব জানিয়ে দিলেন বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বই প্রদান করা হবে। সেজন্য যে সব সংবিধানিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন কেন্দ্রীয় সরকার তা শুরু করে দিয়েছে।

তিনি জোরের সঙ্গে জানান, শরণার্থী বাঙালি হিন্দুদের দীর্ঘমেয়াদি ভিসা বা লং টার্ম ভিসা দেওয়ার কথা ২০১১ সালে পূর্বতন এনডিএ সরকারের মস্তিষ্কপ্রসূত ছিল। কিন্তু কংগ্রেস ভোট-রাজনীতির জন্য অপপ্রচার শুরু করায় সাধারণ মানুষের মনে ভুল ধারণা হয়েছে যে, দীর্ঘমেয়াদি ভিসা ব্যবস্থা মোদী সরকার করেছে। রামমাধব পরিষ্কারভাবে জানান, দীর্ঘমেয়াদি ভিসা শুধুমাত্র বিদেশি নাগরিকদেরই দেওয়া হয় যারা এদেশে পড়াশুনা বা গবেষণা করতে আসবে। ২০১৫ সালের ২৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন, ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালের ৩১ মার্চ অবধি মোট ২৩৯ জন বাংলাদেশি নাগরিক এবং ওই একই সময়কালে পাকিস্তানের ৭৩৩৫ জন নাগরিককে দীর্ঘমেয়াদি ভিসা দেওয়া হয়েছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার এক নির্দেশিকায় জানিয়েছে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ধর্মীয় হিংসায় বলি হয়ে আসা মানুষদের আশ্রয় দিতে ভারত সরকার শুধু বদ্ধপরিকর নয়, তাদের এই দেশের নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হবে।

উবাচ

"আমরা সকল দেবদেবীর কাছে প্রার্থনা করেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ঈশ্বর আমাদের কথা শুনলেন না।"

মঞ্জুনাথ
হনুমান থাপ্পার বন্ধু

ল্যান্সনায়েক হনুমান থাপ্পার মৃত্যুতে।

"মনে হয়, আমার বন্ধু আজমগড় যেতেই পছন্দ করেন।"

উজ্জ্বল নিকম
মুম্বই হামলার মামলায় সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট।

অভিযুক্ত সৈয়দ জাবিউদ্দিন আনসারির উকিল ওয়াহাব খানের ঔরঙ্গবাদ যাওয়ার কথাকে কটাক্ষ করে।

"১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থা জারি করে কংগ্রেস কি সেই সময় দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান জানিয়েছিল? সেক্ষেত্রে কি ইন্দিরা গান্ধীর মানসিকতার সঙ্গে হিটলারের মানসিকতার মিল নেই?"

অমিত শাহ
বিজেপি সভাপতি

"আফজল গুরু এবং মকবুল ভাটের বিচারবিভাগীয় হত্যার (জুডিসিয়াল কিলিং) বিরুদ্ধে, আত্মনিয়ন্ত্রণের গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে কাশ্মীরিদের সংগ্রামে সহমর্মিতা প্রকাশের জন্য।"

জে এন ইউ-তে ৯ ফেব্রুয়ারি 'পোয়েট্রি রিডিং— দি কান্ট্রি উইদআউট এ পোস্ট অফিস'-শীর্ষক সভার পোস্টার।

"নন্দীগ্রামের অভিশপ্ত দিন ফিরিয়ে আনতেই কি বাম-কং আঁতাত?"

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়
নেতা
তৃণমূল কংগ্রেস

আফজল গুরুর মতো সন্ত্রাসবাদীকে শহিদ বানাতে চাইছে কমিউনিস্টরা

দিল্লীর জওহরলাল ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী একদল ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে স্রেফ গাজোয়ারি করে সভা করে। সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে লস্কর-ই-তৈবার অন্যতম পাণ্ডা আফজল গুরুর ফাঁসির প্রতিবাদ করা। গুরুকে ফাঁসি দেওয়া হয় দিল্লীর তিহার জেলে ২০১৩ সালে। কারণ, ২০০১ সালে সংসদ ভবনে যে পাক আত্মঘাতী সন্ত্রাসবাদীরা আক্রমণ চালিয়েছিল তার নেপথ্যে ছিল গুরু। দীর্ঘ ১০ বছর টানা তদন্ত ও বিচার চলাকালে উপস্থিত তথ্য প্রমাণকে সামনে রেখে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত আফজল গুরুকে ফাঁসির আদেশ শোনায়। রাষ্ট্রপতি সেই ফাঁসির আদেশে সম্মতি দেওয়ার পরেও মনমোহন সিংয়ের কংগ্রেস সরকার নানা টালবাহানায় সেই আদেশ কার্যকর করতে অস্বাভাবিক দেরি করে। অবশেষে জনমতের চাপে আফজল গুরুকে ফাঁসি দিতে বাধ্য হয় কংগ্রেস সরকার।

এমন একজন সন্ত্রাসবাদীকে কমিউনিস্টরা শহিদ বানাতে চাইছে। গুরু নাকি কাশ্মীরের আজাদির লড়াইতে যোগ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। অর্থাৎ, ভারতীয় সংসদ ভবনে হামলা চালানো পাক সন্ত্রাসবাদীদের নেতা আফজল গুরু কাশ্মীরের আজাদির জন্য হামলার পরিকল্পনা করেছিল। গল্পের গোরু যে প্রয়োজনে গাছেও ওঠে তা কমিউনিস্টদের সমর্থক ছাত্ররা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে। জে এন ইউ ক্যাম্পাসের সভায় শ্লোগান দেওয়া হয়েছে, ‘কাশ্মীর কো আজাদ করো’, ‘আফজল গুরু অমর রহে’ ‘পাকিস্তান জিন্দাবাদ’ ইত্যাদি। সভার প্রধান আয়োজক জে এন ইউ স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের সভাপতি কানহাইয়া কুমার ও তার অনুগামীরা। এরা সকলেই সিপি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন এ আই এস এফ সমর্থক। এই সভায় সবচেয়ে উত্তেজক স্লোগান দিয়েছিল যে ছাত্রী সে সিপিআই নেতা ডি রাজার কন্যা।

জে এন ইউ চত্বরে সভা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও লোকবল সরবরাহ করেছিল পাকিস্তানের লস্কর-ই-তৈবা।

গূঢ় পুরুষের কলম

লস্করের প্রতিষ্ঠাতা নেতা হাফিজ সইদ স্বয়ং দাবি করেছে যে তার নির্দেশেই ছাত্রনেতা কানহাইয়া কুমার আর তার দলবল আফজল গুরুর ফাঁসির স্মরণ অনুষ্ঠান করেছিল। হাফিজ বলেছে যে, তারা চায় না ভারতীয়রা লস্কর নেতা আফজল গুরুকে বিস্মৃত হোক। মুম্বইতে ২০০৮ সালে হামলার ছকটা ছিল হাফিজের। ১৬৬ জন নিরপরাধ মানুষ সেই হামলায় প্রাণ হারান। মুম্বই হামলায় জড়িত সন্ত্রাসবাদী আজমল কাসভকে জীবন্ত ধরা হয়। পরে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। লস্কর নেতা হাফিজের দাবি কাসভের ফাঁসির স্মরণে মুম্বইতে সভা করা হবে। কাশ্মীরের আজাদি না পাওয়া পর্যন্ত ভারতের মাটিতে হামলা চলবেই।

লস্কর সুপ্রিমো হাফিজ সইদের বিবৃতির পর সিপিআই নেতা ডি রাজা, সিপিএম নেতা সীতারাম ইয়েচুরি এবং জনতা দল (ইউনাইটেড) নেতা কে সি ত্যাগ মহাশয়রা কী বলবেন সেটাই দেখার। জে এন ইউতে স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন তাদের সভাপতি কানহাইয়া কুমারের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতি এই ধর্মঘটকে সমর্থন করেছে। হাফিজ সইদের স্বীকারোক্তির পর এরা কী বলবে। অবশ্য কমিউনিস্টরা চিরকালই দু'মুখো নীতি নিয়ে চলে। একেবারেই নির্লজ্জ বেহায়া। এরা নেতাজীকে তোজোর কুকুর বলে আবার ২৩ জানুয়ারিতে নেতাজীর মূর্তিতে মালা দেয়। রাহুল গান্ধী জে এন ইউতে ছুটে গিয়েছিলেন ছাত্রছাত্রীদের স্বাধিকার আন্দোলনের শরিক হতে। রাহুল লেখাপড়াটা কম করেন। তাই জানেন না যে আফজল গুরুকে ফাঁসি দিয়েছিল কংগ্রেস সরকার। বিজেপির সরকার নয়। নিজের দলের সরকার যাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল সেই ফাঁসির বিরোধিতা করতে রাহুল জে এন ইউয়ের ছাত্র সমাবেশে গিয়ে বিজেপির মুণ্ডপাত করেছেন। একেই বলে নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুলের কোপ মারা।

লস্কর নেতা হাফিজ সাহেব ভারতের ‘অসহিষ্ণুতার’ প্রবক্তাদের ডুবিয়েছে। তেমনি মুম্বই হামলায় যুক্ত ডেভিড হেডলি আমেরিকায় স্বীকারোক্তি দিয়েছে যে আমেদাবাদের কাছে ২০০৪ সালে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইতে মহিলা জঙ্গি ইশরাত জাহান এবং তার তিনজন পুরুষ সঙ্গী জাভেদ গুলাম শেখ, আমজাদ আলি রাণা ও জিশান জোহর মারা যায়। তারা সকলেই লস্কর-ই-তৈবার আত্মঘাতী জঙ্গি ছিল। তাদের আমেদাবাদে পাঠানো হয় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে হত্যার উদ্দেশ্যে। গুজরাট দাঙ্গার প্রতিশোধ নিতে। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে সি বি আই রিপোর্ট দেয় যে তারা নিরপরাধ ছাত্রছাত্রী। মুম্বই থেকে গুজরাট বেড়াতে এসেছিল। পুলিশ ভুয়ো সংঘর্ষে তাদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এবং মানবাধিকার কর্মীরা এতকাল এই বিষয়টি নিয়ে বাজার গরম করে রেখেছিল। হেডলির বয়ানের পরে এদের কি শাস্তি হবে? ▮

মেঃ জেঃ কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অঃ প্রাঃ)

বিগত ৪ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ভারতের দ্বিতীয়বার আন্তর্জাতিক যুদ্ধ জাহাজের প্রদর্শনী ও মহড়া হলো। প্রথমবার এই মহড়া হয়েছিল ২০০১ খৃষ্টাব্দে ছোট আকারে মুম্বই উপকূলে। এবারের মহড়া ভারতের পূর্ব উপকূলে বিশাখাপত্তমের নিকটে অনুষ্ঠিত হলো। মহামহিম রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় সম্মিলিত যুদ্ধ জাহাজ ও বিমানের অভিবাদন গ্রহণ করেন।

বিশ্বের প্রায় সমস্ত রাষ্ট্র যাদের যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে তারা অংশগ্রহণ করেছেন। ভারতের প্রায় ৭৫টি বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধপোত, তিনটি সাবমেরিন, হেলি কপ্টার ও নৌবাহিনীর বিমান অংশ গ্রহণ করেছিল। বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্র যেমন আর্জেনটিনা, অস্ট্রেলিয়া, বাহারিন, বাংলাদেশ, ব্রাজিল, ব্রুনেই, কানাডা, চিলি, চীন, মিশর, ফিজি, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইজরায়েল, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, শ্রীলঙ্কা, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, রাশিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি দেশ যুদ্ধ জাহাজ পাঠিয়েছিল। ভারতের পরিচালনায় এই মহড়া অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন আগামী এপ্রিল মাসে বিশ্ব রণপোত প্রদর্শনী ও মহড়া ভারতে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক নৌবহরের মহড়া।

বিশাখাপত্তনমে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নৌবহরের মহড়া ভারতের নৌবাহিনীকে আরও শক্তিশালী করবে

করবেন। ভারতের অবস্থান ভারত মহাসাগরের তীরে। এই মহাসাগর পণ্য আদান প্রদানের এক মহারাজপথ। বিশ্বের গড় পণ্য উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ এই সমুদ্রপথে যাতায়াত করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত মহাসাগরের গুরুত্ব অপরিসীম।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমুদ্রপথে পণ্য আদান-প্রদান ভারত আরম্ভ করেছিল। প্রায় ৩৩০০ বছর আগে ভারতের এই সমুদ্র পথে পণ্য বিনিময় হোত। কালের প্রভাবে সেই চিন্তার অবলুপ্তি ঘটে। এখন শুধু কাহিনিই সম্বল— চাঁদ সওদাগরের সপ্ত তরী আর 'বাংলার ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়, সিংহল নামে রেখে গেল তার শৌর্য্যের পরিচয়', সমুদ্রের উপর আধিপত্য রাখার সুফল ভারত প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। বিদেশি শক্তির পরাধীনতাও এর একটা কারণ। এই মহড়ার একটা বিশেষ সুফল— মিত্রতা, একে অপরের সঙ্গে কাজ করার একটা সুযোগ যা প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কাজে আসবে। আজও সমুদ্র নিরাপদ নয়। জলদস্যুরা এখনও তাদের তাণ্ডব দেখাচ্ছে। যেমন সোমালি জলদস্যুরা কিছুদিন আগেও পণ্যবাহী জাহাজ কব্জা করে নিয়ে গিয়েছে। কিছু রাষ্ট্র শক্তির মোহে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন মানতে অনীহা প্রকাশ করছে। উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ তাদের সমুদ্রের অর্থনৈতিক অঞ্চল ব্যবহার করতে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সমুদ্র নিয়ে চীন ও জাপানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় পৌঁছেছিল, মহড়ার মাধ্যমে এই সমস্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির অনুকূল উত্তর পাওয়া যাবে। পরস্পরের প্রতি আস্থা ও মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠবে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাহাজ এক যোগে কাজ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে।

স্ট্রাটেজিক দিক দিয়ে ভারত তার স্থল সীমান্ত সুদৃঢ় করার প্রয়াস করছে। এখনও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা আছে। সেই সমস্ত অঞ্চল যখন প্রকৃত সুদৃঢ় হবে, তখন সমুদ্রপথে আক্রমণ নানা ভাবে আসতে পারে। এই বোধোদয় দেরিতে হলেও হয়েছে। ভারতের সর্ব কনিষ্ঠ যুদ্ধজাহাজ 'কাদমাট'ও মহড়ায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই যুদ্ধপোত নির্মাণে প্রায় ৯০ শতাংশ যন্ত্রাংশ ভারতেই নির্মিত, আর ৪৬টি জাহাজ ভারতের বিভিন্ন জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রে নির্মীয়মাণ। দুটি বিমানবাহী জাহাজও ভারতের পক্ষে অংশগ্রহণ করেছিল, 'বিক্রমাদিত্য' ও 'বিরাট'। অনেক বছর ভারতের সমুদ্রাঞ্চল রক্ষা করার পর 'বিরাট' এবার অবসর গ্রহণ করবে। নৌবাহিনীর ইচ্ছা, কোনো রাজ্যে এটি ভারতীয় নৌবাহিনীর যাদুঘর মিউজিয়াম হিসাবে অবস্থান করে মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ ও জ্ঞান বিতরণ করুক।

শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক নৌবহর প্রদর্শনী ও মহড়াই নয়, ভারত

আই এন এস সুমিত্রা থেকে আন্তর্জাতিক নৌ-মহড়ার অভিবাদন গ্রহণ করছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের নৌবাহিনীর সঙ্গে মাঝে মাঝেই দ্বিপাক্ষিক মহড়াও করে থাকে। কোনো রাষ্ট্রের সামুদ্রিক বাণিজ্য যখন উন্নয়নমুখী তখন বাণিজ্যিক জাহাজগুলিকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনও বহুগুণ বেড়ে যায়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় শক্তিশালী নৌবহর নির্মাণ করা সম্ভব হয় না। ভারত এই বিষয়ে অন্য রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে আগ্রহী। ভারতের নৌবাহিনী এই বিষয়ে অনেক আগেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে তারা 'ডিজাইন ডাইরেক্টরেট' স্থাপন করে নৌবাহিনীর প্রতিটি বিভাগের যেমন বিমান, ভাসমান জাহাজ এবং ডুবো জাহাজের আগামী দিনের রূপরেখা নিয়ে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সেই জন্যই ভারতের জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলি নৌবাহিনী ও উপকূল রক্ষী বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের জাহাজ যেমন ডেস্ট্রয়ার (শত্রু জাহাজ ধ্বংসকারী) আই এন এস কলকাতা, আই এন এস রণবীর, আই এন এস রণ বিজয়, ফ্রিগেট, করভেট, মাইন সুইপার, সার্ভে শিপ (জরিপ করার জন্য) ইত্যাদি উপহার দিয়ে চলেছে। ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও বহু জাহাজের প্রয়োজন হবে। এই আন্তর্জাতিক মহড়ার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী এই বার্তাই দিয়েছেন 'এসো ভারতে নির্মাণ কর' (মেক ইন ইন্ডিয়া)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান চাইছে ভারত তার যোগ্য স্থান গ্রহণ করে দক্ষিণ-পূর্ব সামুদ্রিক অঞ্চলে নেতৃত্ব দিক। একটাই বাধা, চীন দক্ষিণ চীন সাগরকে তার নিজের ভূখণ্ড বলে অন্যায় দাবি করেছে। উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে (লিটোরাল স্টেটস) তাদের অর্থনৈতিক এলাকা ব্যবহার করতে দিচ্ছে না। নেতৃত্ব গ্রহণ করলেই ভারত ওই সমস্যায় জড়িয়ে যাবে। এমনিতেই অরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। যদিও অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রয়াস চলছে।

এমতাবস্থায় বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের নৌবাহিনীকে একত্রিত করে আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক আইন সকলের পক্ষেই এবং সর্বত্র প্রয়োগের সহমত সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে। আগামী এপ্রিল মাসে ভারতের উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী নৌবহরের প্রদর্শনী ও মহড়া যদি সফল রূপায়ণ সম্ভব হয়, তাহলে এই পথে অনেকটাই প্রগতি হবে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরেই ভারতের নৌবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে এই সামুদ্রিক অঞ্চলের যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে। ▌

বিজ্ঞাপন চাই

'জন্মশতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'— এই উপলক্ষে স্বস্তিকা আগামী ৭ মার্চ একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে চলেছে। উক্ত সংখ্যাটিতে আপনার প্রতিষ্ঠানের অথবা ব্যক্তিগতভাবে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। বিশদ বিবরণের জন্য স্বস্তিকা দপ্তরে যোগযোগ করুন—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

ফোন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

হিন্দুত্ব কখনও অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দেয় না : ভাইয়াজী যোশী

সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ সুরেশ (ভাইয়াজী) যোশী। শত ব্যস্ততার মাঝেও স্বস্তিকাকে দিলেন আলাদা সময়। স্বস্তিকা-র সঙ্গে তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেলেন আমাদের দুই প্রতিনিধি— অভিমন্যু গুহ ও শুভাশিস রায়।

▯ সন্ত্রাসবাদ তো শুধু ভারতের সমস্যা নয়, গোটা বিশ্বই কোনো না কোনোভাবে সন্ত্রাসের শিকার। সুতরাং সন্ত্রাস রোধে জনসমাজের একটা ভূমিকা রয়েছে। আপনার কী মত?

▯ সমাজের হাতে জেহাদি সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের অধিকার যথেষ্ট কম। বরং অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে এই ক্ষমতা অনেক বেশি দেওয়া রয়েছে। তারাই সন্ত্রাসবাদ রোধে সক্ষম হবেন। এর কারণ হলো জেহাদি সন্ত্রাসবাদীরা অস্ত্র-শস্ত্র ও বিস্ফোরক নিয়ে এসে হামলা করে। সুতরাং নিরস্ত্র মানুষ এদের মোকাবিলা করবেন, এমনটা সহজ নয়। ভাবা উচিতও নয়। সুতরাং আমাদের নিরাপত্তা বাহিনীকে দিয়েই এই কাজ করতে হবে। এর জন্য কেন্দ্রের সেনাবাহিনী, রাজ্যের পুলিশবাহিনীর প্রস্তুত থাকা দরকার। আর সীমান্ত ক্ষেত্রে হলে সীমা সুরক্ষা বল (বি এস এফ) ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে সমাজের একটাই করণীয়। যাবতীয় ভেদাভেদ ভুলে, সবাই একসঙ্গে মিলিতভাবে জেহাদের বিরুদ্ধে আলোচনা করা। যাতে জনমানস জাগ্রত হয়। আর মধ্যে মধ্যে এই জাগরিত শক্তির প্রদর্শনও দরকার। এতে জেহাদ নিয়ে সমাজের মধ্যে যে আতঙ্ক, ভয় রয়েছে তা দূর করতে পারা যাবে।

▯ আপনি পুলিশবাহিনীর কথা বললেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর এ ব্যাপারে অভিজ্ঞতা খুব তিক্ত। খাগড়াগড় থেকে কালিয়াচক--- প্রত্যেকটি ঘটনাতেই পুলিশের নক্কারজনক ভূমিকা। রাজ্যবাসী তথা দেশবাসীকে সুরক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা, বরং দেশের নিরাপত্তাকে আরও বিপন্ন করেছে। কি বলবেন?

▯ ঠিকই। এরকম অবস্থা চললে জেহাদি সন্ত্রাসবাদ কোনোদিনও নিয়ন্ত্রণে আসবে না। এর

জন্য দরকার রাজ্যের শাসন ও মানুষের ভার যাদের ওপর রয়েছে তাদের ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থের ওপরে ওঠা।

▯ সুতরাং জাগ্রত জনমানসের যে কথা আপনি বললেন তার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কী ভূমিকা রয়েছে?

▯ আর এস এস সমাজ জাগরণের কাজেই ব্রতী। আর এস এস তার মর্যাদা বজায় রেখে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদী ঘটনা রুখতে বরাবরই প্রয়াসী। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থাকে শক্তিশালী হতেই হবে। প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনেরই এসব কাজে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সঙ্ঘও তার ব্যতিক্রম নয়।

▯ কিছুদিন আগেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং মুসলমান ধর্মগুরুদের কাছে আবেদন করেছেন যে মুসলমান যুবকদের আই এস-এ যোগদান থেকে আটকান। সুতরাং ভারতীয় মূল্যবোধের শিক্ষার প্রাসঙ্গিকতাই ফের প্রমাণিত হলো।

রাজনাথ সিংয়ের এই পদক্ষেপ সঠিক বলে মনে করেন?

□ অবশ্যই। কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মুসলমান ধর্মীয় ও সামাজিক নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলার যে প্রয়াস নিয়েছেন তা সঠিক দিশা নেবে বলেই আমার অভিমত। জেহাদি সন্ত্রাসবাদকে রুখতে হলে ধর্মসম্প্রদায়ের ঊর্ধ্বে উঠে সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষকে একসঙ্গে এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে হবে।

□ হেডলির সাক্ষ্যে উঠে এসেছে ২৬/১১-র পেছনে ছিল পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র। এরপরেও কি বলবেন ভারত সরকার বর্তমানে পাকিস্তান নিয়ে যে বিদেশ নীতি গ্রহণ করেছে তা সঠিক?

□ এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে বিগত দিনে ভারতে যখনই কোনো সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেছে, তার পেছনে কোনো না কোনো ভাবে পাক-সেনার মদত ছিল। বর্তমানে মুম্বই হাইকোর্টে যে শুনানি চলছে তাতেও এই তত্ত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে। ইতিপূর্বে পাকিস্তানকে নিয়ে কোনো সরকারই সুনির্দিষ্ট নীতি নিয়েছে, এমনটা মনে পড়ছে না। সুতরাং দেখা যাক।

□ ইদানীং একটি কথা খুব শোনা যাচ্ছে সেটি হলো 'অসহিষ্ণুতা'। অনেকে বলছেন এই শব্দটির আগের শব্দ ছিল 'গৈরিকীকরণ'। অন্তত আর এস এসের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ তুলতে গেলে আগে যারা বলতো 'গৈরিকীকরণ হচ্ছে', তাঁরাই এখন বলছেন 'অসহিষ্ণুতা'। আপনি কী বলবেন?

□ এই দু'টি শব্দকে একসঙ্গে জোড়াটাই ভুল। আমরা এটা মানি যেখানে 'গৈরিকীকরণ' হয়েছে, সেখানে 'অসহিষ্ণুতা' সম্ভবই নয়। এই দু'টি শব্দ বিপরীতমুখী। এই যে একটা প্রবণতা চালু হয়েছে গৈরিকীকরণের সঙ্গে অসহিষ্ণুতাকে জুড়ে দেবার সেটা জেনে বুঝে হিন্দু সমাজকে অপমানিত করবার জন্য; বদনাম করবার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্ত। গৈরিকীকরণের সঙ্গে 'হিন্দুত্ব' শব্দ যুক্ত হতে পারে। আর 'হিন্দুত্ব' কোনোদিন অসহিষ্ণুতাকে প্রশ্রয় দেয় না। যেখানে গৈরিকীকরণ, সেখানে সহিষ্ণুতাই থাকে।

□ তাহলে চারিদিকে এই 'অসহিষ্ণুতা', 'অসহিষ্ণুতা' রব উঠছে সেটাকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

□ স্পষ্টতই এই রব তোলা হচ্ছে হিন্দু সমাজকে অপমানিত করার জন্য। এটি একটি ষড়যন্ত্র। কারণ এই যে 'অসহিষ্ণুতা'র অভিযোগে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা 'ব্যথিত' অনুভব করছেন এবং সেই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে স্রেফ হিন্দু-বিরোধী প্রতিক্রিয়া দিচ্ছেন, তাতে এদের উদ্দেশ্যটা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। সমাজের সামনে এদের মুখোশটা খুলে দেওয়া জরুরি।

□ কী মনে হয়, এর পেছনে কোনো বিদেশি চক্রান্ত থাকতে পারে?

□ একেবারেই মনে হয় না। আমি মনে করি এই ভারতেই একটি ভিন্ন মতাদর্শ কাজ করছে, যারা দেশের চরিত্রটিকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু ভারতের জনমানসের চরিত্রকে বুঝতে হলে হিন্দুত্বের বিচারধারার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। আপনি অতীতের উদাহরণ টেনে একটাও ঘটনা দেখাতে পারবেন না যেখানে ভারত হিন্দুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। অথচ ইদানীংকালে পুলিশ-থানায় হামলা করে, হিন্দুদের ব্যবসায়িক কেন্দ্রে আক্রমণ করে সারা দেশে হিন্দু-বিরোধী আবহ তৈরির চেষ্টা চলছে। অথচ এই যারা 'অসহিষ্ণুতা' নিয়ে চর্চায় এত আগ্রহী, এই সমস্ত ঘটনায় তারা কিন্তু চুপ করে বসে রয়েছে। এটা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট চিন্তার বিষয়। আরও দুর্ভাগ্যজনক যে বিহার, উত্তরপ্রদেশ, বাংলা— যে যে প্রান্তে এই হিন্দু-বিরোধী আক্রমণগুলি সংঘটিত হচ্ছে, সেখানকার প্রশাসন কিন্তু এ ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় রয়েছে।

□ ঠিকই খাগড়াগড় থেকে কালিয়াচক সর্বত্রই আমরা এর নজির দেখেছি। কি মনে হয়? রাজ্যের পুলিশের পুরো রাজনীতিকরণ হয়ে গিয়েছে?

□ পুলিশের ঘাড়ে শুধু দোষ দেওয়া ঠিক নয়। পুরো প্রশাসনই মনে হয় অকেজো হয়ে গিয়েছে। এটা সমাজের পক্ষে খুবই দুশ্চিন্তার বিষয়। শান্তি বজায় রাখার জন্য এদের যে মানসিকতা প্রয়োজন, আজ সেটা নিয়েই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

□ এটাও খুব দুর্ভাগ্যজনক যে 'অসহিষ্ণুতা'র নামে দেশের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই রোগের কোনো ওষুধ জানা আছে?

□ ঠিকই। যেভাবে সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রচারিত হয়েছে তাতে বিশ্বের দরবারে ভারতের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হিন্দু সমাজকে কালিমালিপ্ত করা হয়েছে। একটাই কথা বলবো, রাজনৈতিক দলগুলির উচিত তৎক্ষণিক রাজনৈতিক-ফায়দার কথা চিন্তা না করা। ভারত এবং ভারতীয় সমাজের ভাবমূর্তি যাতে বজায় থাকে, তার প্রয়াস সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই মিলিতভাবে করা উচিত। সঙ্কীর্ণ রাজনীতি ছেড়ে তাদের যুক্তিগ্রাহ্য রাজনীতি করাটাই কাম্য।

□ কিন্তু বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এটা কি সম্ভব?

□ হ্যাঁ সম্ভব। কিন্তু সহজ নয়। সৎ প্রয়াস ছাড়া এটা সম্ভব নয়।

□ আপনি কি মনে করেন আমাদের দেশের অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই সৎ?

□ না, আমি মনে করি না। অন্তত এই প্রেক্ষিতে। তারা ক্ষমতা দখলের জন্য সব করতে পারে। এটা চিন্তার বিষয়।

□ আচ্ছা একটা কথা— আর এস এস তো জন্ম-লগ্ন থেকেই শ্রেণীবিন্যাস, জাতিভেদের বিপক্ষে। তাহলে এই নোংরা জাত-পাত ভিত্তিক রাজনীতির সবসময় শিকার হয় কেন তারা?

□ প্রথম বিষয় হলো ভারতে কোনো শ্রেণীবিন্যাস নেই। কিন্তু জাতিভেদ রয়েছে। আর এস এসের স্বয়ংসেবকরা গোড়া থেকে এই জাতিভেদ দূর করতে সচেষ্ট। সামাজিক সমরসতা আনতে স্বয়ংসেবকরা তাঁদের চেষ্টার কোনো ত্রুটি করেননি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভারত আরও একবার নোংরা ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির শিকার হলো। আজ যেটা হচ্ছে সেটাকে বলবো সমাজের মধ্যে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধানোর চেষ্টা। শুধুমাত্র ক্ষুদ্র স্বার্থে। আরও স্পষ্ট করে বললে কিছু নির্বাচনী বৈতরণী পেরনোর জন্য। তবে আমি মনে করি না আর এস এস এ ধরনের রাজনীতির শিকার হচ্ছে। আমরা

কখনোই এসব ব্যাপারে বিচলিত নই। কারণ আমরা জানি আমাদের করণীয়। প্রশ্নটা আর এস এস এর শিকার হলো কি হলো না তা নয়। বরং সমাজের মধ্যে এই যে অনৈক্যের ফাটল ধরানো হচ্ছে চিন্তাটা সেখানেই। এর শিকার হচ্ছে গোটা সমাজ, শুধু আর এস এস নয়। কিছু শক্তি আমাদের সামাজিক ঐক্য বিনষ্টে সক্রিয়। আর এস এসের সামনে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ কীভাবে এই বিষয়টিকে প্রশমিত করা যাবে।

সারা দেশে এই মুহূর্তে আর এস এসের শাখার সংখ্যা কত?

পঞ্চাশ হাজারের বেশি শাখা চলছে দেশজুড়ে। ২০০৮ সালে আমাদের কার্যবিস্তারের যোজনা নেওয়া হয়। যার ফলে ২০১২ থেকে ২০১৫ এই তিন বছরে শাখার সংখ্যা বেড়েছে ১০ হাজারেরও বেশি।

সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আর এস এসের প্রচার যে খুব শক্তিশালী হচ্ছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ফলে শাখার কার্যক্রম কি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

না, তা নয়। সোশ্যাল মিডিয়া থেকেও অনেকে নিত্য শাখায় আসছেন। জয়েন আর এস এস অ্যাপের মাধ্যমে সঙ্ঘের কর্মপ্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছেন বহু মানুষ। এখন বছরে গড়ে প্রায় তিন হাজার যুবক শুধু এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিত্য শাখাতেই আসছেন শুধু নয়, সঙ্ঘের প্রাথমিক শিক্ষা বর্গ, সঙ্ঘ শিক্ষা বর্গ ইত্যাদিতেও তাঁরা অংশ নিচ্ছেন। এমনকী তাঁরা বিস্তারক, প্রচারকও বেরোচ্ছেন। গত দু'তিন বছরে দু' হাজারের বেশি যুবকদের শাখার সংখ্যা বেড়েছে।

এমনও প্রস্তাব এসেছে যে খাকি হাফ প্যান্টের বদলে সঙ্ঘের গণবেশ (ইউনিফর্ম)-এ ট্রাউজার আনা হোক। তাহলে সঙ্ঘের পালেও কি আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলো?

এটা আধুনিকতার বিষয় নয়। আর এস এস একটি প্রাণবন্ত সংগঠন। আর প্রাণবন্ত সংগঠন হলে কিছু পরিবর্তন তো অবশ্যম্ভাবী। আমাদের কর্মপ্রক্রিয়াতে পরিবর্তন এসেছে। দেশের, সমাজের প্রয়োজন অনুসারে আলোচনার বিষয়বস্তু পাল্টেছে। সুতরাং পোশাক পরিবর্তন হলে তাতে নতুনত্ব কিছু থাকবে না।

কিন্তু একটি পরিবর্তন তো অবশ্যই হয়নি! সেটি হলো এই প্রচার সর্বস্বতার যুগেও আর এস এসের প্রচার বিমুখতা। আজ যখন প্রচার চমক (পাবলিসিটি স্টান্ট) গোটা দুনিয়াকে আচ্ছন্ন করেছে, তখন আর এস এস স্রোতের বিপক্ষে কেন?

এই কথাটা বোধহয় সর্বাংশে ঠিক নয়। ১৯৯৬ সালে আমাদের 'প্রচার বিভাগ' চালু হয়। আমরা সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়িয়েছি। টেলিভিশন চ্যানেলে আলোচনার জন্য লোক তৈরি করে পাঠাচ্ছি। বছরে দু'বার প্রত্যেকটি রাজ্যে সাংবাদিক সম্মেলনের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। আমরা 'লেটারস টু দ্য এডিটর' (সম্পাদকের নিকট পত্র) নামে একটি খুব বড়ো ফোরামও গঠন করেছি। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা আলাদা আলাদা সম্মেলনেরও আয়োজন করছি। গত দু'বছর ধরে এই বিষয়টির চর্চা চলছে। দেশের জন্য, সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এমন বিষয় নির্বাচন করে তার ওপর স্তম্ভলেখক তৈরির জন্যই এটি ভাবা হয়েছে।

কিন্তু সঙ্ঘের বিষয়ে কিছু সংবাদমাধ্যমের ভ্রান্ত ধারণার আজও অবসান হলো না কেন? বিশেষ করে বাংলাতে।

দেখুন, বাংলার সংবাদমাধ্যমের অনেকাংশ ভিন্ন মতাদর্শের ভিত্তিতে চলছে। অন্য আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতার জন্যই তারা সঙ্ঘ-বিরূপতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

আপনার আঙুল নিশ্চয়ই কমিউনিস্টদের দিকে?

অবশ্যই। বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি তাদের আকর্ষণের জন্যই তারা আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে। আমাদের আবেদন, তারা নিরপেক্ষভাবে চলুক। বাঁয়ে যাবার দরকার নেই। ডানদিকেও যাবার দরকার নেই। তারা জনমত গঠন করতে সৎ ভূমিকা গ্রহণ করুন। জাতীয় স্বার্থে সঠিক দিশা দিন। আমি বলছি না তারা আর এস এসকে সমর্থন করুন। কিন্তু সঙ্ঘ-বিরোধী সস্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে কিছু না করাই বাঞ্ছনীয়। যাই করুন, প্রমাণের ওপর নির্ভর করে করুন। মনগড়া সংবাদ পরিবেশন না করাই উচিত। সংবাদমাধ্যমের দায়িত্ব নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বাংলায় সেটা না থাকলে তা হতাশজনক। বাংলার সংবাদ মাধ্যমের এই বাম মনস্তত্ত্ব থেকে বেরিয়ে আসা উচিত।

কিন্তু এটাও তো সত্যি যে কমিউনিস্টদের যেমন অমর্ত্য সেনের মতো অর্থনীতিবিদ; ইরফান হাবিব, রোমিলা থাপার, রজতকান্ত রায়ের মতো ইতিহাসবিদ রয়েছেন— যাঁরা অর্থনীতি কিংবা ইতিহাস চিন্তায় যতটা না সময় কাটান, তার থেকে অনেক বেশি সময় দেন বামপন্থার ভাবনায়। এদের বিরুদ্ধে লড়তে সঙ্ঘের কোনো আদর্শগত ব্যক্তিত্ব তৈরির পরিকল্পনা নেই?

না। এই মুহূর্তে সেটা নেই। তবে স্বস্তিকা রয়েছে। শঙ্খনাদ রয়েছে। মানুষের কাছে সঙ্ঘের আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এরা বড়ো ভূমিকা নেবে। এই ব্যবধান ঘোচানোর দায়িত্ব স্বস্তিকাকেই নিতে হবে।

১৯৪৮ থেকেই আমরা এই দায়িত্ব মাথা পেতে নিয়েছি। তাই জন্মলগ্নেই আমাদের তৎকালীন প্রবল পরাক্রমশালী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর রোষে পড়তে হয়েছিল।

ঠিকই। মিডিয়ার ভূমিকা অবশ্যই সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে হবে। সমাজকে বিপথে চালনা করার জন্য নয়। সুতরাং বাংলার সংবাদমাধ্যমকে নির্দিষ্ট আদর্শের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে উদারমনা হতে হবে। কারণ গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যম বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করে। তাদের সংকীর্ণমনা হলে চলবে না, চরমপন্থী হলে চলবে না।

আমার শেষ প্রশ্ন। ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ে ভারতের স্বার্থ কতটা সুরক্ষিত রইলো?

এটা বহুদিনের পড়ে থাকা বিষয়। বর্তমান সরকার এই সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এসেছে। এর সিদ্ধান্ত হয়তো আগেই হয়েছিল কিন্তু তখন তা কার্যকরী হয়নি। আজ সেটা কার্যকর হচ্ছে। হয়তো এর ফলে ভারতকে তাৎক্ষণিক কিছু ক্ষতি স্বীকার করতে হলো। কিন্তু সীমান্ত-সুরক্ষার দিক দিয়ে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এর ফলে আমাদের সুদূরপ্রসারী লাভ হবে। ▌

দৃষ্টি ও ব্যাপ্তি

সুরেশ যোশী

১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে বালাসাহেব দেওরস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। ওইসময় আমি কেবল তাঁর নাম শুনেছিলাম। তিনি সরসঙ্ঘচালক এবং আমি একজন স্বয়ংসেবক এই সম্পর্ক। ১৯৭৫-এ আমি প্রচারক হয়েছি। আমার মনে আছে, সরসঙ্ঘচালক হিসাবে তাঁর প্রথম প্রবাস মুম্বই শহরে হয়েছিল। মুম্বইয়ের কার্যক্রমের সব ব্যবস্থাই ভাল ছিল, কেবল একটু খুঁত ছিল। বালাসাহেবজীকে যে সময় বলা হয়েছিল, নিমন্ত্রণপত্রে সেই সময় লেখা ছিল না। নিমন্ত্রণপত্রে কার্যক্রম ৫টার সময় ছিল। কিন্তু তাঁকে বলা হয়েছিল যে ৫-৩০ মিনিটে পৌঁছতে হবে। সূচনানুসারে তিনি ৫-৩০ মিনিটে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই কানাকানি হচ্ছে যে কার্যক্রম দেরিতে শুরু হচ্ছে। গুরুজীর সময়ে কখনও এরকম হয়নি। বালাসাহেবের মনেও এই ধারণা হলো যে অবশ্য কিছু ভুল হয়েছে। তিনি কার্যকর্তাদের ডেকে বললেন— 'এরকম ভুল সংগঠন ও তার প্রভাবকে প্রভাবিত করে'। বালাসাহেবের প্রতি আমার প্রথম অনুভব এইরূপ ছিল যা আজও স্মরণীয়। সার্বজনিক কার্যক্রমে ৫টার সময় বলে ৫-৩০ মিনিটে শুরু করলে কোনো ক্ষতি হয় না। সঙ্ঘের পরম্পরাতে এইরূপ হয় না, কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে এই ঘটনা ঘটেছে। পরবর্তীকালে সকলে এই কথার গুরুত্ব বুঝেছে এবং স্বীকার করেছে যে বড়ই ভুল হয়েছে।

১৯৭৫ সালে সঙ্ঘের উপর যখন নিষেধাজ্ঞা ছিল তখনই আমি প্রচারক বেরিয়েছি। বালাসাহেব ও আমার প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কারণ ৪ জুলাই সঙ্ঘের উপর প্রতিবন্ধ এসেছে এবং ৩০ জুন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ভয় ও ঔৎসুক্য দুই-ই মনের মধ্যে ছিল। পরে ১৯৭৭-এর মার্চ মাস পর্যন্ত একপ্রকার অজ্ঞাতবাসই ছিল। বালাসাহেবজীর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব ছিল না কিন্তু কিছু কথা শোনা যাচ্ছিল। তিনি ইয়ারবেদা জেলে ছিলেন। কারাগারে অনেকে মিসা বন্দীও ছিলেন। সঙ্ঘের মতাদর্শের ছাড়াও অন্য নেতারা ওখানে ছিলেন। আমি যতদূর জানি বালাসাহেবজী ওই সময় ওই সমস্ত নেতার

বালাসহেব দেওরস

খোঁজ-খবর নিজের থেকে নিতেন। ফলে অনেকের সঙ্গে বালাসাহেবের গভীর সম্পর্ক হয়েছিল এবং তাঁরা সঙ্ঘকেও বুঝেছিলেন। জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পর সঙ্ঘের কাজ পুনরায় শুরু হলো এবং সরসঙ্ঘচালকের প্রবাসও শুরু হলো। সেই সময় আমি থানে জেলাতে জেলাপ্রচারক ছিলাম। বনবাসী অঞ্চলে বালাসাহেবের প্রবাস ঠিক হলো। থানে জেলাতে প্রবাসের কারণে বনবাসী বন্ধুদের জীবন, তাঁদের প্রতি দেখার দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় কার্যকর্তাদের ও সমাজের সামনে রাখলেন। কারণ সেই সময় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ অখিল ভারতীয় রূপ গ্রহণ করছিল। আমার মনে হয় ১৯৭৭-এর প্রবাস বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কাজ সর্বত্র আরম্ভ হওয়ার সূচনাই ছিল। তাঁর উপস্থিতিতে বনবাসী সম্মেলন, অনেকের প্রচেষ্টাতে ওখানকার পূর্বনির্ধারিত কার্যক্রম সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। তখন বালাসাহেবের নিবাস কিছুদিনের জন্য এক বনবাসী কার্যকর্তার বাড়িতে হয়েছিল, যা কার্যকর্তাদের নিকট প্রেরণাদায়ী ছিল। কোনো অখিল ভারতীয় কার্য খাড়া করতে গেলে পূর্বপ্রস্তুতি কেমন দরকার— সেটা তার শিক্ষা ছিল।

পরবর্তীকালে বালাসাহেবের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হতে থাকল। সরসঙ্ঘচালক হিসাবে তাঁর নেতৃত্ব আমরা অনুভব করতে থাকলাম। অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভায় আমার উপস্থিতি ১৯৮৩-র পর শুরু হলো। অতএব ১৯৮৩-র পরই তাঁকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। কিন্তু তার পূর্বে প্রদেশে প্রবাসের কারণের মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। 'সংগঠন শাস্ত্র' বালাসাহেবের আয়ত্তে ছিল। কার্যকর্তাদের সামনে তাঁর বিষয় প্রস্তুতি সেইরকমই ছিল। বিশ্বরাজনীতির অভিমুখ বদলের জন্য বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর গভীর অধ্যয়ন ছিল। তাঁর কথাবার্তার বিষয় ছিল যুদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এবং আমাদের মনে হোত যে বালাসাহেবের অধ্যয়নের ব্যাপকতা অনেক বেশি। বিভিন্ন বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করতেন, সেগুলোকে নিজেদের কাজে লাগানোর কথা ভাবতেন। তাঁর কথাবার্তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবরণ প্রায়ই থাকত এবং সেই সমস্ত উদাহরণ সংগঠনের প্রয়োজনে বোঝাতেন।

সেই সময় মীনাক্ষীপুরমের ঘটনা ঘটেছে। সেই ঘটনার স্বাভাবিকভাবে সারাদেশে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সকলেরই সঙ্ঘের কাছে কিছু প্রত্যাশা ছিল, তা উচিতও ছিল। আবার ওই ব্যাপারে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নামে এক ব্যাপক জনসম্পর্ক ও সমাজ জাগরণের কাজ শুরু হয়েছিল। মীনাক্ষীপুরমের ঘটনার পর এক বিশেষ প্রকারের চর্চা শুরু হয়েছিল— এটা আমার অনুমান। সেই সময় চর্চার মাধ্যমে লোকে জিজ্ঞাসা করত এবং আমাদের মতো কার্যকর্তা সহজেই উত্তর দিত— 'ইসলামি দেশ থেকে আসা পয়সা এর মূল। অথবা খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বারা ধর্মান্তরণ অন্য দেশ থেকে আর্থিক সাহায্যের পরিণাম। এসব থেকে বোঝা যায় ধর্মান্তরকরণের পিছনে

আর্থিক কারণ আছে। সম্পূর্ণ না হলেও কয়েকমাস পরে সমাজের লোক এটাকেই সত্য হিসেবে স্বীকার করতে শুরু করেছে।

বালাসাহেব এই সব বিষয়কে বিচার করার এক দৃষ্টিকোণ দিয়েছেন— তা হলো, ধর্মান্তরকরণ কেবল অর্থের জন্য হয় না, বরং আমাদের সমাজের কিছু দোষের কারণে হয়। আর আমার মনে হয়--- এই চর্চা মীনাক্ষীপুরমের ঘটনার পর শুরু হয়েছে। সঙ্ঘের মধ্যেও এক আলাদা দৃষ্টিতে ভাবনা শুরু হয়েছে— কেবল বাইরে থেকে আসা পয়সার কারণেই ধর্মান্তরণ হচ্ছে, তা মেনে নেওয়া ঠিক নয়। এতে ধর্মান্তরণের সমস্যা কম হবে না। এর অন্য কিছু কারণ আছে এবং তা খোঁজার চেষ্টা করতে হবে। সততার সঙ্গে বিচার করা প্রয়োজন। 'নিজেদের সমাজের বন্ধুদের প্রতি দুর্লক্ষ্য'— এটাই এর বড় কারণ। তাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার ও সামাজিক বৈষম্যই হলো এর মূল কারণ। এসব কথা না ভেবে আমরা কেবল ভাবি— 'বহিঃশক্তি কত প্রবল'। এতে ভাবনার দিক সঠিক হবে না এবং তার থেকে সঠিক সন্তোষও পাওয়া যাবে না। আমার বিশ্বাস এইরকম স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি বালাসাহেবই মানুষকে দিতে পারেন যার থেকে পরবর্তীকালে সামাজিক সমরসতার বিষয় আরম্ভ হয়েছে, যা আমরা সকলেই জানি।

আমাদের দেশে একাত্মতার ভাব নির্মাণ করার জন্য কোন্ বিষয়ের প্রয়োজন, তার চর্চা শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে ভারতমাতা, ভারতমাতার প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর চর্চা হচ্ছিল। কিন্তু সাধারণ জনগণের মধ্যে এই নির্গুণ নিরাকার অনুভূতি আসছিল না। তাঁরা শ্রদ্ধার বিষয়ে বুঝতে পারেন। ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিষয়ে সহজেই সাধারণ মানুষ জোটবদ্ধ হয়। তাই ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর ও কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্য জানানোর জন্য গঙ্গা ও ভারতমাতা— এই দুই প্রকার কল্পনাকে সর্বসমক্ষে রেখে এক বড় রথযাত্রা সম্পন্ন হয়েছিল। ওই সময় প্রবীণ কার্যকর্তারা যা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা যে অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা আমাদের মতো সাধারণ কার্যকর্তাদের অনুভব হয়েছিল। এটা ছিল এক বিশাল পরিকল্পনা যাতে সারা দেশের দশকোটি হিন্দু একই সময়ে কেবল ভারতমাতা ও গঙ্গামাতার দর্শনের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। এই কার্যক্রমে গঙ্গার প্রতি ভক্তিভাব জাগ্রত হয় এ দৃশ্য সারা দেশে দেখা গেছে। এটা ছিল অভূতপূর্ব প্রয়োগ। গঙ্গার সঙ্গে ভারতমাতাকে মেলানোর যে প্রয়াস হয়েছিল, আমার মনে হয় এর পিছনে বড় ভাবনা ছিল। এই সবকিছুর মধ্যে বালাসাহেবের নিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল।

এরপরই রামজন্মভূমি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। কিছু বিষয় আছে যা পরস্পর সম্পর্কিত। মীনাক্ষীপুরম, একাত্মতা রথযাত্রা এবং রামজন্মভূমি আন্দোলন সবই এক দশকের ঘটনা (১৯৮০-১৯৯০)। এই দশ বছরের মধ্যে সারা দুনিয়ার লোক হিন্দু শক্তির দর্শন করেছে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মাধ্যমে। এর দ্বারা সঙ্ঘের সঙ্গে সমগ্র হিন্দু সমাজেরও আত্মবিশ্বাস বেড়েছে— এটা সারা দুনিয়ার লোক অনুভব করেছে। সুপ্ত হিন্দু শক্তি ধীরে ধীরে জাগ্রত হচ্ছে।

অযোধ্যার মন্দিরের জন্য আন্দোলন ও তার নির্মাণ— এটা হলো রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের জাগরণ। মন্দির তো অনেক আছে কিন্তু অযোধ্যায় রামমন্দিরের মহত্ত্ব কী? আমার বিশ্বাস, এই কাজ করার জন্য দেশের সর্বসাধারণ লোক স্বীকার করেছে, মনস্থির করেছে এবং সব কিছু করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। এক বিশাল পরিবর্তনের জন্য তীব্র ইচ্ছা এই কালখণ্ডে জাগ্রত হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সালে সম্পন্ন করসেবা থেকেই এই তীব্র ইচ্ছার প্রকাশ এই কালখণ্ডের মধ্যে হয়েছে। আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, হিন্দু সমাজের জাগরণের এই প্রক্রিয়ার মূলে ছিলেন পূজনীয় বালাসাহেবজী।

মূল্যবোধের শক্তি আছে এবং বালাসাহেব এই শক্তিকে ভালভাবেই জানতেন। তিনি সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতিতে এই শক্তিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছেন, তাঁর সম্পূর্ণ কার্যকালের মধ্যে সংগঠন রীতিতে ধীরে ধীরে লাগু করার চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ, সহজ সম্পর্ক সূত্র, ব্যক্তি নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ, সঙ্ঘস্থানে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে শরীর ও মনের ওপর অনুশাসনজনিত সংস্কার, ব্যক্তি নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার মতো বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি জোর দিতেন। এর সঙ্গে সঙ্ঘের শাখা অর্থাৎ স্বয়ংসেবকের প্রতিও জোর দিতেন।

স্বয়ংসেবক এক ব্যক্তি হিসাবে এবং শাখা এক ব্যবস্থা হিসাবে সমাজ জীবনে সম্পর্কিত। এই সম্পর্কের কারণে সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা বুঝে তার সমাধানের জন্য বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন কার্যক্রম হওয়া চাই— এরকম তাঁর আগ্রহ ছিল। (নিজের শাখা কেবল চিকিৎসা কেন্দ্র রূপে নয়, সমাজ পরিবর্তনকারী ব্যক্তিদের কাজ— এরকমই তাঁর ধারণা ছিল।) তার ফলে সঙ্ঘের সমস্ত কার্যক্রমের পরিকল্পনার সময় এই বিষয়ে অভ্যাস বারবার চলত। নিজের শাখা, তার পরিসর, সমগ্র সমাজ ইত্যাদি বিষয়ের উপর মনোযোগ দেওয়ার কথা তিনি বারবার বলতেন এবং তার স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ ১৯৮৯ সালে ডাক্তারজীর জন্মশতবর্ষে যেমন কার্যক্রমের আগ্রহ করা হয়েছিল সেই ভাবেই সেবা বিষয়টি সঙ্ঘের ব্যবস্থার মধ্যে এসে গেল।

বালাসাহেবজী বলতেন যে আমাদের সঞ্চলন, গণবেশ, শারীরিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয়ে গর্ববোধ হয় কিন্তু এগুলো সঙ্ঘের ছবি নয়। সঙ্ঘকে এর থেকে অনেক এগিয়ে যেতে হবে। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক সমাজের একজন অনুঘটক; সমাজের থেকে আলাদা নয়। সমাজের দুঃখ-কষ্ট সে বোঝে, সেই অনুভূতি মানুষেরও থাকা উচিত। সেইজন্য সেবা বিষয় শুরু হয়েছে। একথা সত্য যে সেবাকাজ নতুন বিষয় নয়। প্রাকৃতিক সংকটের সময় সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যথাস্থানে উপস্থিত থেকে সহজভাবে সেবাকাজ করে। কিন্তু বালাসাহেব বলেছেন— 'কেবল সঙ্কটের সময় নয়, সর্বদা যারা সঙ্কটে থাকে বা কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করে এরকম লোকের সংখ্যা সমাজে অনেক। এই সমাজ আমাদের ভাবনার কেন্দ্র ও লক্ষ্য হওয়া চাই, তাদের কষ্ট আমাদের বোঝা উচিত।' এর দ্বারা সমাজের দুর্বল ও উপেক্ষিত ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি সেবাকাজের মাধ্যমে কীভাবে দেওয়া উচিত তা তিনি সবার সামনে রেখেছেন এবং পরবর্তীকালে সেবাকাজের বীজ বপন করেছেন— যার পরিণাম আজ দেখা যাচ্ছে। সঙ্ঘের ভাবধারায় তৈরি অনেক সংস্থা সেবাকাজ করে চলেছে। সামাজিক কাজে প্রতিযোগিতার কোনো স্থান নেই। সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানের লক্ষ্যে স্বয়ংসেবকদের কাজ করতে হবে— এরকম একটা বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গি বালাসাহেবের কার্যকালে বিকশিত হয়েছে।

সমাজের মধ্যে সামাজিক বিষমতা লুপ্ত হওয়া চাই, তাই সমরসতার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে, ব্যবহারিক কথাবার্তায় এবং কার্যকর্তাদের মনে তিনি সমরসতার ভাব সৃষ্টি করতেন। তাঁর কার্যকালে কেবল ভাবনা নয় বাস্তবিক ক্ষেত্রে অনেক সেবাকাজ শুরু হয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সমরসতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়— এতে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর আগ্রহ ছিল, আমাদের ব্যবহারেও সমরসতা আসা উচিত। সেই সময় এক দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছিল, যা আজ দৃশ্যমান হচ্ছে। সমরসতা বিষয়ে সঙ্ঘ আজ সামাজিকভাবে পরিকল্পনা করছে, চেষ্টাও করছে— এই ছবি সমাজে দেখা যাচ্ছে। প্রচার হয়ে থাকে— সঙ্ঘ বৈষম্যকে বাড়ানোর জন্য কাজ করছে— এরকম প্রচার অত্যন্ত অনুচিত। বালাসাহেবের দৃষ্টি ও তাঁর ব্যাপ্তি— দুইয়ের প্রভাবে সঙ্ঘের অনেক রীতি প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং আচরণের মধ্যে এসেছে— এটা আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

(লেখক রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

চাষার ব্যাটার দিদি-শরন

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

সামনেই ভোট। এখন জোট। কে কার হাত ধরবে তার লুকোচুরি খেলা চলছে। তবে আসল চালটা দিদিই দিলেন। বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার অসম্ভবও আমাদের দিদির কাছে জলভাত। দেখিয়ে দিলেন তিনি। আরাবুল রেজ্জাক ভাই ভাই। ভাবা যায়!

২০১৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি সিপিএম থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার ঠিক আগে রবীন্দ্রসদনে দলিত এবং সংখ্যালঘুদের নিয়ে কনভেনশনে রেজ্জাক বলেছিলেন, রাজ্যে বর্ণভিত্তিক রাজনীতির নিরিখে ভোটের পাটিগণিত তাঁর জানা। শুধু রসায়নের খোঁজে আছেন। সেটা করে দেখাতে পারলেই কেল্লাফতে করে দেবেন।

এর পরে রেজ্জাক সাহেব নতুন দল গড়ে বিস্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেও দল চালানোর সূত্র খুঁজে পাননি। গত দু'বছরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং বিজেপি ছাড়া প্রায় সবার সঙ্গেই বৈঠক করেছেন। হাত বাড়িয়েছিলেন রাহুল গান্ধীর দিকেও। সাড়া পাননি। অনেকদিন পর্যন্ত মুকুল রায়ে ভরসা রেখেছিলেন রেজ্জাক। আশা ছিল, নতুন বিরোধী জোটের সফল কারিগর হবেন মুকুল। কিন্তু সে ভরসা-মুকুলও ঝরে গিয়েছে। ফলে রেজ্জাকও মুকুলের মতোই শাসক শিবিরের দরজায় কড়া নাড়েন। কারণ, তাঁকে রাজনীতিতে ভেসে থাকতে হবে। ভোটের রাজনীতি ছাড়া যা সম্ভব নয়। টানা চারদশক ধরে ভোটে জিতছেন রেজ্জাক।

নেতাজী ইন্ডোরে যে মমতা তাঁর পিঠে হাত রাখলেন, ২০১০ সালে ক্যানিংয়ের জীবনতলায় সেই মমতার সভা পণ্ড করেছিল রেজ্জাকের লোকজন। খবরের কাগজে পড়লাম, তাঁর গঠিত 'ভারতীয় ন্যায়বিচার পার্টি'তে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের বক্তব্য, সিপিএমে থাকার সময়েও রাজনীতির মাঠে তাঁদের রেয়াত করেননি রেজ্জাক। তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং অনুগত শওকত মোল্লার বাহিনীর সামনে তাঁদের প্রাণ হাতে করে পালাতে হয়েছে। সহকর্মীরা বলেছেন, পরের দিকে নিজের মতো করে চলার পাশাপাশি নিজের ইচ্ছে দলের উপরে চাপিয়ে দিতেন রেজ্জাক। দলের চেয়ে বেশি কথা শুনেছেন পরিবারের লোকজনের। যেমন রেজ্জাকের ছোট ছেলে মুস্তাক আহমেদ। এক সময় তাঁর কথাতেই আসিফ খানকে দলে নিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন রেজ্জাক। তাঁর দলে যোগও দেন আসিফ। কিন্তু মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই দল ছাড়েন। সংগঠন গড়ার মতো লোক রেজ্জাকের দলে ছিল না। টাকাপয়সার জোগান এবং পেশিশক্তির জন্য আসিফকে নিতে চাইলেও পরে সারদা নিয়ে 'কোণঠাসা' আসিফ আর বিপত্তি বাড়াতে চাননি।

বরাবর তাঁর দল এবং গণমঞ্চের নেতাদের রেজ্জাক আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, স্বীকৃত দলগুলির সঙ্গে দর-কষাকষি করে ভোটে লড়ার আসন আদায় করে আনবেন। কিন্তু সেই আলোচনায় দলের অন্যেরা জায়গা পাননি। জোট বা দলের কথা ভাবার চেয়ে নিজের কথাই বেশি ভেবেছেন রেজ্জাক। ফলে সহকর্মীদের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছেন। রেজ্জাকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ফারুখ আহমেদের কথায়, ''এবারেই সত্যিকারের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হতে পারে রেজ্জাককে। কারণ, ২০১১ সালে সিপিএম সম্পর্কে মানুষের বিতৃষ্ণা তৈরি হলেও সচেতনভাবে নিজেকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন রেজ্জাক। ফলে প্রবল সিপিএম-বিরোধী হাওয়াতেও তিনি জিতেছিলেন। এবার তাঁর আর সেই সুযোগ নেই।'' পাশাপাশিই অবশ্য ফারুখ বলেছেন, ''পরিস্থিতি যা-ই হোক, রেজ্জাককে জেতাতে চেষ্টার কোনো কসুর কিন্তু থাকবে না।''

বারবার অবস্থান বদলে নিজের বিশ্বাসযোগ্যতাকেও ধাক্কা দিয়েছেন। এই তৃণমূলের সঙ্গে প্যাঁচ কষছেন তো ওই যোগাযোগ করছেন সিপিএমের সঙ্গে। এই বলছেন 'হয় ক্যানিং নয় নাথিং' তো ওই সুড়সুড়িয়ে চলে যাচ্ছেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের দরজাটা আবার খুলতে। এই আব্দুর রেজ্জাক মোল্লাকে চিনতেন না তাঁর সহযোগীরা। তিনি বরাবরের দাপুটে নেতা। মাটির নাড়ি বুঝতেন। সদর্পে নিজেকে 'চাষার ব্যাটা' বলতেন। মাটির ভাষায় কথা বলতেন। যার সঙ্গে আলিমুদ্দিনের মূলধারার রাজনীতি মিলত না। সেই রেজ্জাক এখন বিশ্বাস করছেন মমতার বরাভয়ের উপর। তৃণমূলের মঞ্চে মমতার পাশের আসনে বসে নিজের দর মাপজোক করছেন। হিতৈষীকে বলছেন, মমতাই তাঁকে জেতাবেন দায়িত্ব নিয়ে। আশায় বাঁচে চাষা। আশায় বাঁচছেন চাষার ব্যাটাও!

কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা—
হেলে ধরতে না পেরে
কেউটে ধরতে গেলেন
না তো!

— **সুন্দর মৌলিক**

চিঠিপত্র

অপশাসন মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ

গত ২০ জানুয়ারি মেদিনীপুরে এক জনসভায় বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেছেন পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূলের অপশাসন মুক্ত করতে তারা বিজেপির হাত ধরতেও প্রস্তুত। বিমানবাবুর এই প্রস্তাবের পেছনে নির্বাচনী রাজনীতির গণিত রয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভার ভোটের হিসেবকে বিধানসভার সামনে ভাগ করলে দেখা যাচ্ছে রাজ্যের চারটি রাজনৈতিক দলের শক্তি এই রককম : টিএমসি ৩৯.৪ শতাংশ, বামফ্রন্ট ২৯.৯ শতাংশ, বিজেপি ১৬.৮ শতাংশ এবং কংগ্রেস ৯.৭ শতাংশ ভোট পেয়েছে। তৃণমূল আশা করে বসে আছে ভোট ভাগের ফলে তারা আবার ক্ষমতায় আসবে। টিএমসি-র অপশাসনের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে হলে সমস্ত বিরোধী দলের একসঙ্গে জোট বেঁধে লড়ার কোনো বিকল্প নেই। ভোটের হিসেব অনুসারে আসন ভাগ করে একের বিরুদ্ধে এক দাঁড় করিয়ে এই অপশাসন মুক্তির জন্য জনসাধারণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। অন্যথায় বিরোধীরা যদি এক না হন তবে সিপিএমের মতো এই জগদ্দল পাথর আবার পশ্চিমবঙ্গের বুকে চেপে বসবে যার ফল হবে বঙ্গকে পশ্চিম বাংলাদেশে পরিণত করার পথ প্রশস্ত করা।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা-৬৪।

শিক্ষকতার চাকরি বিক্রি

অবশেষে 'ঝোলা থেকে বেড়াল' বেরিয়ে পড়েছে। এতদিন যে খবরটা ছিল রটনা, প্রচার বা 'ঢাক ঢাক গুড়গুড়'—সেটা এবার এসেছে প্রকাশ্যে। এ রাজ্যের অগণিত সচেতন মানুষ বিশেষ করে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতী মাত্রই জ্ঞাত যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এক একটা চাকরি বিক্রি হয়েছে চার থেকে আট লক্ষ বা তারও চেয়ে বেশি টাকায়। কিছু সংখ্যক ধনী পিতার কাছে ওই পরিমাণ টাকা ব্যয় করা খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার না হলেও বহু সংখ্যক পিতা বা অভিভাবকের কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে সারাজীবনের সঞ্চয়ে পড়েছে হাত। এমনকী, তাতেও না কুলোনোয় সোনাদানা, জমিজমা বা সম্পত্তি বেচে জোগাড় করতে হয়েছে টাকা। আর এই লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়েছে কারা? শাসকদলের নেতা, কর্মী ও চ্যালাচামুণ্ডারা। তবে অনেকের বিশ্বাস, ওই টাকার একটা অংশ পৌঁছে গিয়েছে ঊর্ধ্বতন আরও অনেকের পকেটে। শাসকদলের ওই সব প্রতারকও চিটফান্ডের এজেন্টদের ন্যায় গ্রাম-গঞ্জ-শহর-নগরের চেনা-জানা চাকরিপ্রার্থী বা তাদের পিতা- মাতা বা অভিভাবকদের কাছে গিয়ে বুঝিয়েছে যে শূন্যপদ মাত্র কয়েক হাজার, কিন্তু পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ। পরীক্ষা ভালো দিলেও চাকরির গারান্টি নেই, তবে পরীক্ষা ভালো না হলেও আছে চাকরির গ্যারান্টি। কারণ তাদের সুপারিশেই কর্তৃপক্ষ ঠিক করবে কে চাকরি পাবে আর কে পাবে না। কাজেই নির্দ্বিধায় তাদের হাতে টাকাটা তুলে দিক। আরও যুক্তি, চাকরিটা পেলে তিন-চার বছরে টাকাটা উঠে আসবে। তারপর শুধু উপার্জন আর উপার্জন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম-আয়েস, সামাজিক প্রতিপত্তি, বাড়ি, গাড়ি, সারাজীবনের নিশ্চিন্ততা, আরও কত কী? তাছাড়া অবসরের পরেও আছে পেনশন বা অবসরকালীন সুবিধা-সহ অন্যান্য আর্থিক প্রাপ্যতা। আছে পারিবারিক পেনশনও।

তাই এতদিন যেটা ছিল রটনা বা প্রচার, সেটা যে আসলে ঘটনা তা প্রকাশ পেয়েছে বালুরঘাটে এক দলীয় বৈঠকে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী তথা তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক এক স্বীকারোক্তিতে। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, 'চাকরির নামে কেউ টাকা নিয়ে থাকলে অবিলম্বে তা ফেরত দিন। নইলে, বাড়িতে হামলা হলে দল তার দায় নেবে না।' দিদির রাজত্বে এটাই কী বেকারদের ভবিতব্য?

—**ধীরেন দেবনাথ,**
কল্যাণী, নদীয়া।

গোরু ও হিন্দু সংস্কৃতি

অতি প্রাচীনকালে যখন বেদ রচনা হয়েছিল তখন মানুষ ভক্তের স্তরে উঠতে শেখেনি। সে যুগে, দেবতার উপাসনা পদ্ধতি বিশুদ্ধ ব্যবহারিক প্রয়োজন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যজ্ঞ ছিল এই উপাসনা পদ্ধতির আনুষঙ্গিক ক্রিয়া। ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনায় যজ্ঞ করতেন এবং পশুবলি দিতেন। তবে একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, অশ্বমেধ যজ্ঞে কেবলমাত্র একটি ঘোড়া বলি দেওয়া হোত, ৬০০ গোরু নয়। যাই হোক, এটি ছিল ভারতীয় দর্শন চিন্তার চারটি স্তরের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয় স্তর ছিল উপনিষদের যুগ। সেখানে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধকে উপেক্ষা করে জ্ঞানমার্গে বিশ্বসত্তাকে জানবার জন্য আগ্রহশীল হয়েছিল। এই জিজ্ঞাসার ফলে যে দর্শন গড়ে উঠেছে তাকে বলা হয় সর্বেশ্বরবাদ বা ব্রহ্মবাদ। এই দর্শন বলে সকল মানুষ, সকল জীব, সকল জড় বস্তুকে জড়িয়ে নিয়ে এক মহাশক্তি সবকিছু ব্যাপ্ত করে আছেন এবং নিজে প্রচ্ছন্ন থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তৃতীয় স্তরে পাওয়া যায় ষড় দর্শনের যুগ। তখন ব্যবহারিক প্রয়োজন বোধের পুনরায় আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু ভিন্নভাবে।

দুঃখ হতে পরিত্রাণ বা ইচ্ছা পূরণের জন্য নয়, জন্ম বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের জন্য। তবে তার উপায় হিসাবে দ্বিতীয় স্তরের জ্ঞানমার্গকেই অবলম্বন করা হয়েছে। শেষে এসেছে পৌরাণিক যুগ। তখন ঈশ্বরকে বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে তাঁর ওপর সকল মৌলিক শক্তি আরোপ করে তাঁকে ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর সত্তা হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। ঈশ্বরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা হেতু ভক্তি হয়ে উঠেছে সাধনার রীতি।

এইভাবে তৃতীয় স্তরের মোক্ষলাভের যুগ ও শেষ স্তরের ভক্তি যুগে বিশ্বের সকল জীব ও জড় পদার্থকে ঈশ্বরের অংশ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। তাই শুধু গোরু নয়, যে কোনো ক্ষুদ্র জীবকেও হত্যা করা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কাজ বা পাপ হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে।

মহাভারতের যুগ থেকে গোরুকে স্বদেশকে ও গোমাতাকে মাতৃদেবতা হিসাবে কল্পনা করে পূজা করা হয়ে আসছে। এই হিন্দু সংস্কৃতি যখন প্রচলিত হয়, তখন আমাদের এই দেশ ভারতবর্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ ছাড়া আর অন্য কেনো ধর্মের মানুষ ছিল না। তাই এই সংস্কৃতি হলো হিন্দু সংস্কৃতি ও তার পীঠস্থান হলো এই হিন্দুস্থান।

এই দর্শন ও এই সংস্কৃতি আজকের কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বা কোনো রাজনৈতিক দলের চাপিয়ে দেওয়া নয়। হয়ত কোনো কোনো সংগঠন এর পৃষ্ঠপোষকের ভূমিকা পালন করছে। আর কিছু ক্ষমতালোভী স্বার্থান্বেষী হিন্দু রাজনৈতিক কারণে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এই হিন্দু সংস্কৃতির বিকৃত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে।

—**কৃষ্ণ কুমার দাস,**
সিংগাতলা, মালদহ।

হিন্দুদের ইতিহাস লেখা দরকার

ভারতের সভ্যতা যে কত প্রাচীন তা আমরা অনেকেই জানি না। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের মতে ভারতের সভ্যতা ৮৫০০ বছর প্রাচীন। যেমন মেহেরগড় সভ্যতার উৎখননের অধিকর্তা J. F. Garrige-এর অভিমত হলো ৫৫০০ বছর প্রাচীন হরপ্পা সভ্যতারও ৩০০০ বছর পুরনো হলো মেহেরগড় সভ্যতা। এই ৮৫০০ বছরের মধ্যে ৭৫০০ বছরই স্বাধীন ছিল ভারত। বিগত ১০০০ বছরই আমরা ভারতীয়রা পরাধীন ও গোলাম ছিলাম। এই পরাধীন যুগের ইতিহাস কি যথার্থভাবে লেখা হয়েছে? আমাদের হাতে যা তথ্যপ্রমাণ আছে তা থেকে বলা যায় ১৯৪৭ সালের পরে যারা ভারতের শাসনক্ষমতায় ছিলেন তাঁরা ছিলেন সেকুলার তথা অন্ধ হিন্দুবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক। এদের কাজ ছিল হিন্দু সমাজ, সংগঠন, ধর্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে অশ্রদ্ধা ও ঘৃণা প্রচার করে হিন্দুদেরই মধ্যে ভারত-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি ও তাদের মগজধোলাই করা এবং অপরদিকে মুসলমান শাসকদের প্রশংসা ও গৌরব প্রচার করা। যদিও ইংরেজ শোষণ ও অত্যাচারের বর্ণনা ইতিহাসে কমবেশি হয়েছে, কিন্তু মুসলমান অত্যাচার ও শোষণের ইতিহাস লেখায় আদৌ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বললে অসত্যই বলা হবে। ভারতে মহম্মদ বিন কাসিম থেকে আওরঙ্গজেব অর্থাৎ ১৭০৭ পর্যন্ত চলেছে জিজিয়া কর (সম্রাট আকবর ওই কর তুলে দিয়েছিলেন বলা হয়)। কিন্তু জিজিয়া ও তার ফলাফলের কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি। হিন্দুদের কী কী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুসলমান করা হোত সে ইতিহাসও লেখা হয়নি। হিন্দু জনসংখ্যা হ্রাস ও মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি যে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে সে বিষয়ে গবেষণা হয়নি বললেই চলে। আমাদের কেবল ইংরেজের শোষণ ও অত্যাচারের তথ্যপ্রমাণ দেখানো হয়। যেমন ধরুন অক্সফোর্ড ইউনিয়নে শশী থারুর তাঁর বক্তৃতায় বলেন, 'বৃটিশরা যখন ভারতে জাহাজ ভেড়ায়, সেই সময় বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের অবদান ছিল ২৩ শতাংশ। আর বৃটিশরা যখন চলে গেল, ততদিনে তা ৪ শতাংশের নীচে নেমে এসেছিল। কেন? শুধু এই কারণেই যে, ভারতকে তখন শাসন করা হয়েছে বৃটেনের লাভের জন্য' (ভরতাজির, ৮০ খণ্ড, ১৮ শ সংখ্যা পৃ. ১০)। কিন্তু মুসলমান ও খৃষ্টান শাসনাধীন ভারতে হিন্দুরা কীভাবে ক্ষয় হয়েছে সে ঘটনা উল্লেখ করা হয় না কেন?

যখন প্রথম মুসলমানরা আসে তখন ছিল ৬০ কোটি হিন্দু। কীভাবে হিন্দুরা প্রায় ২০ কোটি হয়ে গেল এই প্রশ্নই স্বামী বিবেকানন্দের। 'When the Mohammedans frist came we are said– I think on the authority of Ferista, the oldest Mohammedan historian to have been six hundred millions of Hindus. How we are about two hundred millions' (The Complete Works of Swami Vivekananda, V. 5, p. 233)।

আমাদের ইসলামিকরণের ইতিহাস অনুসন্ধান করা দরকার যে ইসলামিকরণের ফলে সিন্ধু, বালুচিস্তান, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হলো ১৯৪৭ সালে ওই অঞ্চলের হিন্দুদের বাসভূমির অধিকার হরণ করে।

—**ড. কৃষ্ণকান্ত সরকার,**
কলকাতা-৫৫।

সবার প্রিয়
®
বিল্লদা
চানাচুর
'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর, জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

পরম্পরা

নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা ভরতমুনি

অমিত ঘোষ দস্তিদার

আদিম মানুষের চেতনার উন্মেষ ও বুদ্ধি যতই বিকশিত হতে থাকল ততই সৌরভিত হতে থাকল সাংস্কৃতিক দিক। অঙ্গভঙ্গি থেকে নৃত্য, শব্দপ্রক্ষেপণ, গান, নাটক ইত্যাদি। প্রাচীন অঙ্কন এর অন্যতম এক প্রমাণ।

আস্যেনালম্বয়েদ্ গীতং হস্তেনার্থং প্রদর্শয়েৎ।
চক্ষুর্ভ্যাং দর্শয়েদভাবং পাদাভ্যাংতালমাদিশেৎ।।
যতো হস্ত স্ততো দৃষ্টি যতো দৃষ্টি স্ততো মনঃ।
যতো মন স্ততো ভাবো যতো ভাব স্ততো রসঃ।।

অর্থাৎ মুখের দ্বারা গান, হাতের মুদ্রা দ্বারা। মুদ্রা হলো হাতের আঙ্গুল দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির সুচারু অর্থ প্রকাশ করা। মুদ্রা দুই রকম— অসংযুক্ত মুদ্রা অর্থাৎ এক হাতের আঙ্গুল দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির সুচারু অর্থ প্রকাশ করা। সংযুক্ত মুদ্রা, অর্থাৎ দুই হাতের আঙ্গুল দ্বারা বিশেষ বিশেষ ভঙ্গির সুচারু অর্থ প্রকাশ করা। সেই গানের অর্থ প্রকাশ, নেত্রদ্বয় দ্বারা ভাব প্রদর্শন এবং পায়ের দ্বারা তাল ও লয় রক্ষা করা।

যেখানে হাত সেখানে দৃষ্টি, যেখানে দৃষ্টি সেখানে মন, যেখানে মন সেখানে ভাব, আর যেখানে ভাব সেখানেই রস সৃষ্টি। এই রস সৃষ্টিতেই আসে নৃত্য-গান-নাটক ইত্যাদি শিল্পের সার্থকতা।

ভারতবর্ষের উচ্চাঙ্গ নৃত্যগুলি হলো— তামিলনাড়ুর ভরতনাট্যম, উত্তরভারতের কত্থক, ওড়িশার ওড়িশি, মণিপুরের মণিপুরী।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে মেনে যে রূপ প্রকাশ করা হয় তাই-ই ভরতনাট্যম্ নৃত্য। ভাব-রাগ-তালের মিলিত এক পূর্ণরূপ বিকাশ-ই হলো ভরতনাট্যম্। ভরতনাট্যমের প্রাচীন নাম 'সাদীর' অর্থাৎ চতুর নৃত্য। কুচিপুড়ি, কুরুভঞ্জি, ভগবতমেলা নাটক প্রভৃতি এই নৃত্যের নাট্যরূপ। নৃত্যের রকমফের সাতরকমের— আলারিপু, যদিস্বরম্, শব্দম্, বর্ণম্, পদম্, তিলানা, অভিনয়।

বিগত দিনে অরণ্য এক বিরাট সাধনা ও শিল্প আবিষ্কারের ক্ষেত্র ছিল যা আজ নেই। বর্তমান নগর সভ্যতা একে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলেছে। এক শিল্পকে আনতে গিয়ে অন্য এক বিরাট শিল্পের জলাঞ্জলি ঘটেছে। বেদের জন্মই প্রকৃতি এবং প্রকৃতিজাত অরণ্য থেকে। নদী-ঝরনা-পশু-পাখির অঙ্গভঙ্গি, শব্দ— সব ধ্বনিই সুরেলাবদ্ধ। ঋষিকবিদের কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে এবং অঙ্গ থেকে অঙ্গে তা শোভিত হোত।

'গীতিষু সামাখ্যা'— সাম অর্থে 'গান'। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণবিধি —ঋক্ মন্ত্র। ঋক্ মন্ত্রে সাতটি স্বর যোজনা করে সামগান করার সময় ঋত্বিকগণ কর ও অঙ্গুলি সঞ্চালন দ্বারা বিভিন্ন স্বরের উপর জোর দিতেন। এইভাবে মুদ্রা এলো। সামবেদের যুগে সপ্ত স্বরের নাম ছিল— ক্রুষ্ট, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্ত্র এবং অতিস্বার্য। সামবেদের এই সপ্ত স্বরই পরবর্তীকালে ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ— এই সপ্ত সুরের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে সুবিশাল সঙ্গীত ধারার সৃষ্টি করেছে।

চতুর্বেদের নিষ্ঠা নিয়ম ছিল খুব বেশি। ফলে সাধারণ মানুষের বৃহৎ অংশ এতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন না। ভাষ্যকর, শ্রুতর্ষি, বেদজ্ঞারাই অংশগ্রহণ করতে পারতেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মা সমাজের গরিষ্ঠ অংশের জন্য সহজ সরল এক বেদ রচনা বা সৃষ্টির কথা ভাবলেন। সেই বেদই হলো পঞ্চমবেদ। ব্রহ্মা বললেন পঞ্চমবেদ হবে— ঋক্‌বেদ থেকে পাঠ, যজুর্বেদ থেকে অভিনয়, সামবেদ থেকে সঙ্গীত, অথর্ববেদ থেকে রস নিয়ে সর্বজন

দৃশ্যগ্রাহ্য এবং শ্রাব্যমূলক এক হৃদয়গ্রাহী বিষয়। তাহলে সাধারণ মানুষ এবং সমস্ত মানুষের হৃদয় তা গ্রহণ করতে পারবে। ভরতমুনি ব্রহ্মার আশিসে তাঁর একশত শিষ্যের সাহায্যে দেব ও অসুরের কাহিনি নিয়ে নাট্য রচনা করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন।

ভরতমুনি অভিনয়কে চার ভাগে ভাগ করেছেন— 'আঙ্গিকো বাচিকশ্চৈব, আহার্যঃ সাত্ত্বিকস্তথা'। আঙ্গিক— অঙ্গ দিয়ে অভিনয়। 'আঙ্গিক' আবার তিন রকম— শারীর, মুখজ, চেষ্টাকৃত। 'বাচিক' হলো স্বর, উচ্চারণ, ছন্দ-লয়-যতি, ভাবব্যঞ্জনা। 'আহার্যঃ' একটি অপূর্ব উদাহরণ। নানা উপকরণ সহযোগে যেমন আমাদের আহার্যবস্তু সুন্দরভাবে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, অভিনয়েও তেমনি সাজ-সজ্জা, পোশাক, অলঙ্কার ইত্যাদি অবশ্যই অপরিহার্য। 'সাত্ত্বিক' অর্থে সত্তাভিনয়। অন্তর দিয়ে অভিনয় করে দর্শককে মুগ্ধ করা।

সংস্কৃত নাটকের ভিত্তি খুবই উচ্চ আদর্শবিশিষ্ট। স্বয়ং ব্রহ্মা দৃশ্যকাব্যের সৃষ্টিকর্তা। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা ব্রহ্মার আদেশে নাট্যশালা নির্মাণ করেছিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা 'ত্রিপুরদহ' এবং 'অমৃতমন্থন' নামে দুটি নাটক রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত নাটক এবং নাটকের প্রেক্ষাগৃহ সম্বন্ধে ভরত নাট্যশাস্ত্রে বিস্তারিত বিবরণ আছে। নাট্যশাস্ত্র আমাদের জানাচ্ছে, প্রেক্ষাগৃহ— 'রিক্রুষ্ট' অর্থাৎ আয়তাকার, 'চতুরস্র' অর্থাৎ বর্গাকার, 'ত্রস্র' অর্থাৎ ত্রিকোণাকার এই তিনরকম আকৃতির ছিল। বড় প্রেক্ষাগৃহের পরিমাপ ছিল ১০৮ হাত বা ৫৪ গজ, যা ছিল দেবতাদের জন্য। মাঝারি প্রেক্ষাগৃহের পরিমাপ ছিল ৬৪ হাত বা ৩২ গজ, যা ছিল রাজাদের জন্য। ছোট প্রেক্ষাগৃহের পরিমাপ ছিল ৩২ গজ বা ১৬ হাত, যা ছিল সর্বধারণের জন্য।

সে যুগের নাট্যকলা ছিল নিখুঁত, শক্তিশালী ও জনপ্রিয়। বিশ্বে আজও নাট্যশিল্পের ব্যাকরণগত আলোচনায় ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রই প্রথম ও শেষ কথা।

"তস্মাচ্ছাস্ত্রম্ প্রমাণম্ তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্মা ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্রবিধানোক্তম্ কর্ম কর্তুমিহার্হসি।।"

অর্থাৎ কর্তব্য কী, অকর্তব্য কী এসব নির্ধারণ করে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র। ভরতমুনিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে স্মরণে রেখে ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র-বিধান অনুসারে কর্ম কর।

"ভরতগুরুরিত্যক্ষরং যস্য জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে।
তস্য কৃত্বা পঞ্চমবেদম্ অবশ্যম্ভাবি সফলম্।।"

অর্থাৎ যাঁদের রসনাগ্রে ভরতমুনির কৃপা অবস্থান করে তাঁদের দ্বারা পঞ্চমবেদ অবশ্যই সফল হয়ে চির সত্যের পথে থাকবে।

শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

হিন্দু সমাজের চেতনা জাগরণের কাজে স্বামী প্রণবানন্দ প্রতিষ্ঠিত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র ভূমিকা সুবিদিত। সেই সঙ্ঘের শতবর্ষ উপলক্ষে স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— 'শতবর্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ'। প্রকাশিত হবে আগামী ৭ই মার্চ। তথ্যসমৃদ্ধ এই সংখ্যাটি হবে সংরক্ষণযোগ্য, এই সংখ্যাটির বহুল প্রচারের জন্য আপনার কতকপি প্রয়োজন তা আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জানান।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

অপ্রতিরোধ্যা অম্বা

সুতপা ভড়

কাশীরাজের তিন কন্যা— অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা। রূপে, গুণে অনন্যা। তাদের বিবাহ উপলক্ষে কাশীরাজ প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় রীতি অনুযায়ী আয়োজন করলেন স্বয়ংবর সভার। কোশল, পুণ্ড্র, বঙ্গ, কলিঙ্গ আরও অনেক রাজ্যের রাজারা কাশীতে সমবেত হলেন, স্বয়ংবর সভায় অংশগ্রহণ নিমিত্ত। ইতিমধ্যে ভীষ্ম এসে পৌঁছেছেন। চিরকুমার ভীষ্মের স্বয়ংবর সভায় আগমন সবার মধ্যে কৌতূহল উদ্রেক করল। তাঁরা বিদ্রূপের সঙ্গে তির্যক মন্তব্য করতে লাগলেন। মহামতি ভীষ্ম তাঁদের সবাইকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন এবং পরাজিত করে তিন রাজকন্যাকে নিয়ে হস্তিনাপুরের উদ্দেশে রওনা হলেন— উদ্দেশ্য বৈমাত্রেয় ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে তিন বোনের বিবাহ দেওয়া।

পথিমধ্যে সৌবল রাজ শল্যের আবির্ভাব। রাজা শল্যকে অম্বা পূর্বেই মনে মনে স্বামীরূপে বরণ করেছিলেন। সেজন্য রাজা শল্য অম্বাকে পেতে চাইলেন— ফলস্বরূপ যুদ্ধ। অম্বার অনুনয়ে যুদ্ধে পরাজিত শল্যকে প্রাণভিক্ষা দিলেন ভীষ্ম। যথাসময়ে হস্তিনাপুর আগমন। বিবাহের আয়োজন চলছিল এমন সময় অম্বা জানালেন তিনি মানসিকভাবে শল্যকেই স্বামীজ্ঞানে বরণ করেছেন। ভীষ্ম সসম্মানে অম্বাকে শল্যর কাছে পাঠিয়ে অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বৈমাত্রেয় ভাই সত্যবতী-পুত্র বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন। এদিকে পরাজিত, অপমানিত শল্য অম্বাকে বিবাহ করতে রাজি হলেন না। তিনি অম্বাকে ভীষ্মের কাছে ফিরে যেতে বললেন।

অগত্যা অম্বার হস্তিনাপুর প্রত্যাবর্তন। ভীষ্ম সব শুনে বিচিত্রবীর্যকে অনুরোধ করলেন অম্বাকে বিবাহের জন্য। কিন্তু

বিচিত্রবীর্য রাজি হলেন না। অম্বা এবার ভীষ্মকে অনুনয় করলেন তাঁকে বিবাহের জন্য। চিরকৌমার্য্যের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ভীষ্ম তাঁর অপরাগতা নিবেদন করলেন। এরপর বেশ কয়েক বছর অম্বার হস্তিনাপুরে অতিবাহিত হলো। ভীষ্ম অন্তিম চেষ্টা করলেন অম্বা-শল্য মিলনের। কিন্তু শল্য আবার প্রত্যাখ্যান করলেন অম্বাকে।

প্রায় ছ' বছর হস্তিনাপুর রাজভবনে বসবাস করে আশা-নিরাশায় দোদুল্যমান ভালবাসার জন্য নিবেদিতপ্রাণা রাজকুমারী অম্বা ব্যথিতা, উপেক্ষিতা হয়ে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ, ক্রোধিত হয়ে উঠলেন। তাঁর অন্তরের ক্রোধ, ঘৃণা পুঞ্জিভূত হলো ভীষ্মের বিরুদ্ধে। নিজের জীবনের এই লাঞ্ছনার জন্য ভীষ্মকেই তিনি একমাত্র দায়ী জানালেন। ভীষ্মের অনিষ্টই হলো অম্বার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। বিধির নির্মম বিধান— অম্বার প্রতিজ্ঞার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল ভীষ্মের জীবন তথা কৌরবদের ভাগ্য। সামগ্রিক ভাবে বলা যেতে পারে, ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা হলো অম্বার এই অঙ্গীকারকে কেন্দ্র করে।

এরপর অম্বা বিভিন্ন রাজ্যের রাজাদের কাছে ভীষ্মের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য আগ্রহ করলেন। কিন্তু কুরুকুলের এই দুর্দমনীয় যোদ্ধার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের সাহস সম্পূর্ণ ভারতে কোনো নৃপতির ছিল না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অম্বা অরণ্যে তপস্যা শুরু করলেন। দেবতা তুষ্ট হলে অমলিন পদ্মের মালা উপহার দিলেন অম্বাকে। এই মালা যে গলায় দেবে, সে হবে ভীষ্মের চরম শত্রু। মালা নিয়ে পুনরায় বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ অম্বার। অথচ কাউকে পেলেন না যিনি ভীষ্মের সঙ্গে শত্রুতা করার— ভীষ্মকে বিনাশ তথা হত্যার সাহস রাখেন। সবশেষে রাজা দ্রুপদের সভায়ও প্রত্যাখ্যান। অভিমানিনী অম্বা ওই স্বর্গীয় মালা দ্রুপদের প্রাসাদের দরজায় ঝুলিয়ে চলে যান অরণ্যে।

অরণ্যে পরশুরামের দর্শন। অম্বার জীবন-বৃত্তান্ত ব্যথিত করল তাঁকে। নিষ্পত্তিস্বরূপ তিনি চাইলেন শল্যকে রাজি করিয়ে অম্বার সঙ্গে তাঁর বিবাহের আয়োজন করা। কিন্তু অম্বা রাজি নন। অবলা, নিরাশ্রয়া নারী কেবলমাত্র পুরুষের চারপাশে ঘোরার উপগ্রহ নন। তিনি এখন চান প্রতিশোধ। ভীষ্মের মৃত্যুই তাঁর একমাত্র কাম্য। ক্রুদ্ধ পরশুরাম প্রচণ্ড লড়াই করলেন ভীষ্মের সঙ্গে। সেখানেও গঙ্গাপুত্রের জয়। পরাজিত পরশুরাম অম্বাকে ভীষ্মের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনার অনুরোধ করলেন। অম্বা নিজ সিদ্ধান্তে অটল।

দুঃখে, ক্রোধে প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে অম্বা সিদ্ধান্ত নিলেন জগতের কারও থেকে কোনো প্রত্যাশা নয় নিজেই হবেন ভীষ্মের নিয়তি। হিমালয়ের নির্জনে তিনি আরম্ভ করলেন কঠোর তপস্যা। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব বর দান করলেন— এজন্মে নয়, পরবর্তী জন্মে অম্বা হবেন ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ। এজন্মে যখন নয় তখন এই দেহ ধারণ করা অবাঞ্ছিত। সুতরাং স্থিরপ্রতিজ্ঞ অম্বা নিজের চিতা বানিয়ে করলেন আত্মদাহ। চিতার আগুনে এই জন্মের মন-প্রাণের আগুন নেভালেন অম্বা।

যথাসময়ে শিবের অনুগ্রহে রাজা দ্রুপদের ঘরে এক কন্যারত্নের জন্ম। রাজকন্যার লালনপালন রাজপ্রাসাদেই হতে থাকল। একদিন রাজকন্যার চোখে পড়ে ওই অমলিন পদ্মের মালা। এতদিনেও ভীষ্মের ভয়ে কেউ ওই মালায় হাত দেয়নি। রাজকন্যা মালাটি নিজের গলায় অবলীলায় পরে নিলেন। মেয়ের এই দুঃসাহসে রাজা দ্রুপদ বিস্মিত, ভীত হলেন। নির্দেশ দিলেন রাজকন্যাকে গভীর জঙ্গলে রেখে আসতে। অরণ্যবাসে থাকাকালীন রাজকন্যা কঠোর তপস্যা করলেন, শিক্ষা করলেন অস্ত্রবিদ্যা। ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী এই দুর্ধর্ষ যোদ্ধার নাম হলো শিখণ্ডী। তখন তিনি নিজেকে নারী থেকে পুরুষে পরিবর্তিত করেছেন।

এরপর কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ। এই ধর্মযুদ্ধে ভীষ্ম কৌরবপক্ষের হয়ে অস্ত্রধারণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে কৌরবপক্ষকে হারানো কৃষ্ণার্জুনের পক্ষেও অসম্ভব প্রতীত হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুযায়ী অর্জুনের রথে শিখণ্ডীর উপস্থাপনা। শিখণ্ডীর বাণ ভীষ্মকে বিব্রত করে তুলল। ক্রুদ্ধ দেবদত্ত অস্ত্রধারণ করতে গিয়েও পারলেন না। তিনি জানতেন শিখণ্ডী পুরুষ হলেও জন্ম তাঁর কন্যারূপে হয়েছিল। যুদ্ধে স্ত্রীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ নিষেধ। নীতিজ্ঞ ভীষ্ম বাণ নিক্ষেপ করতে পারলেন না। তিনি নিরুপায়। শিখণ্ডীকে তিনি চিনতে পারলেন, অনেকদিন পৃথিবীতে থাকা হলো— আর নয়। সময় হয়েছে স্বর্গালোকে ফিরে যাবার। ইতিমধ্যে শিখণ্ডী ও অর্জুনের তিরে ক্ষত-বিক্ষত শরীর আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না, পড়ে গেল, ভূমিশয্যায় নয় শরশয্যায়— আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষায়। অম্বার উদ্দেশ্য সফল হলো। শিখণ্ডীর জন্ম সার্থক হলো।

স্ত্রীর পারম্পরিক চরিত্র, পরম্পরা, মূল্য, নৈতিকতা, শুচিতা এসব দিয়ে বিচার করা যাবে না ব্যতিক্রমী অম্বাকে। নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্কা কিশোরী অম্বা যৌবনের প্রারম্ভেই বারংবার প্রত্যাক্ষ্যাত হয়েছেন। পুরুষের এই কঠোরতা তাঁকে কঠোরতর করে তুলেছে। পরবর্তী জীবনে অম্বা তাই প্রতিবাদিনী নারী হিসাবে ঠিক করেন বিবাহ তাঁর জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। নিজের জীবন নির্ণয়ে তিনি স্বতন্ত্র, অন্যের চাপিয়ে দেওয়া কাজে অসম্মতির অধিকারে অধিকারিণী। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে পুনর্জন্ম গ্রহণ এবং ধারণ করলেন শিখণ্ডীরূপ। নিঃস্বার্থ তিনি। অথচ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তাঁর অবদান অসামান্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের নিয়ন্তা তিনি। যুদ্ধে অপরাজয়ী ভীষ্মকে পরাজিত করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর।

বাস্তবে ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই কৌরবপক্ষের পরাজয় হয় সুনিশ্চিত। ধর্মের জয় হয় নিরঙ্কুশ। এই ধর্মযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অবদান শিখণ্ডীর। স্বয়ং জনার্দন তাঁর সাহায্যপ্রার্থী। সেজন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন তিনি। উদ্দেশ্য সফল হয়। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধর্মের পুনঃস্থাপনায় অন্যতম সহায়ক শিখণ্ডী তথা অম্বার দান। অনস্বীকার্য, অপরিমেয়। ■

পাখির বাসা

সুকুমার রায়

মানুষ যেমন নানারকম জিনিস দিয়ে নানা কায়দায় নিজেদের বাড়ি বানায়—কেউ ইট, কেউ পাথর, কেউ বাঁশ-কাদা, কেউ মাটি; কারও এক-চালা, কারও দো-চালা।

পাখিরাও সেরকম নানা জিনিস দিয়ে নানান কায়দায় নিজেদের বাসা বানায়। কেউ বানায় কাদা দিয়ে, কেউ বানায় ডালপালা দিয়ে, কেউ বানায় পালক দিয়ে, কেউ বানায় ঘাস দিয়ে। তার গড়নই বা কতরকমের— কারও বাসা লম্বা চোঙার মতো। এক-একটা পাখির বাসা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়, তাতে বুদ্ধিই বা কত খরচ করেছে আর মেহনতই বা করেছে কত। পাখির বাসা তোমরা অনেকেই দেখেছ বোধ হয়। কেমন সুন্দর করে শুকনো ঘাস দিয়ে বুনে তার বাসাটি সে তৈরি করে। পাছে কোনো জন্তু বা সাপ বাসা আক্রমণ করে, সেজন্য বাসায় ঢুকবার রাস্তা তলার দিকে। শত্রুকে জব্দ করবার আর-একটা উপায় তারা করেছে— অনেক সময় বাসার গায়ে আর-একটা গর্তের মতো মুখ তৈরি করে রাখে, সেটা কেবল ঠকাবারই জন্যে, তার ভেতর দিয়ে বাসার মধ্যে ঢোকা যায় না।

টুনটুন পাখি তার বাসা তৈরি করার আগে দুটি কি তিনটি পাতা সেলাই করে একটা বাটির মতো তৈরি করে; তার মধ্যে নরম ঘাস-পাতা দিয়ে সে তার বাসাটি বানায়। সেলাইয়ের সুতো সাধারণত রেশমেরই ব্যবহার করে; কাছে রেশম না থাকলে যে সুতো পায় তাই দিয়ে করে। সেলাইয়ের ছুঁচ হলো তার সরু ঠোঁট-জোড়া। বাসাটা অনেকটা দোলনার মতো ঝুলতে থাকে। খুব ছোট জাতের পাখিরা হিংস্র জন্তু আর সাপ গিরগিটির আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে প্রায়ই ওইরকম দোলনার মতো বাসা তৈরি করে থাকে। অনেক জাতের পাখি আবার মাটিতেই বাসা করে; গাছে বাসা তারা পছন্দই করে না। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার বাসা তৈরিই করে না। নিজেরা গাছের আড়ালে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আর মাটিতে গর্ত করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে। মোরগ, তিতির, পেরু এরা সবই এই জাতের। আবার কোনো- কোনো পাখি সুন্দর করে লতাপাতা দিয়ে কুঞ্জবনের মতো বানায়। অস্ট্রেলিয়া দেশের 'কুঞ্জ-পাখি' (Bower bird) তার বাসার সামনে খুব সুন্দর লতা-কুঞ্জ তৈরি করে। পাখিটি আকারে ছোট বটে, কিন্তু কুঞ্জটি কিছু ছোট হয় না। এদের আবার রংচঙে জিনিসের বড় সখ; ভাঙা কাচ, পাথর, রঙিন জিনিস, যা সামনে পাবে সব এনে বাসার চারদিকে সাজিয়ে রাখবে।

কোনো-কোনো পাখি থুতু দিয়ে বাসা তৈরি করে। তালচোঁচ পাখি এই জাতের। পালক, ঘাস এসব জিনিস থুতু দিয়ে জোড়া লাগিয়ে তার বাসা তৈরি হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া দ্বীপপুঞ্জে এক জাতের তালচোঁচ আছে, তারা কেবলই থুতু দিয়ে নিজেদের বাসা বানায়। চীন দেশে এ বাসার খুব আদর; চীনারা এর ঝোল বানিয়ে খায়। এইজন্য সে দেশে এর দামও খুব বেশি।

অনেক জাতের পাখি কাদা দিয়েও তাদের বাসা বানায়। আফ্রিকার ফ্লামিঙ্গোর বাসা কাদার তৈরি। একটা ঢিপির মতো কাদা সাজিয়ে তার মাঝে একটা গর্ত করে ফ্লামিঙ্গো ডিম পাড়ে। আরও অনেক জাতের পাখিও কাদার বাসা বানায়; তাদের অধিকাংশই আফ্রিকার।

তোমরা অনেকেই বোধহয় কাঠ-ঠোকরা দেখেছ। এরা ঠোঁট দিয়ে ঠোকর মেরে গাছের গায়ে গর্ত করে তার ভিতর বাসা বানায়। দুষ্টু ছেলেরা ছানা চুরি করার লোভে কাঠ-ঠোকরার বাসার গর্তে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে অনেক সময় সাপের কামড় খায়, কারণ সাপেরা কাঠ- ঠোকরার বাসা ডাকাতি করে অধিকার করতে বড় পটু।

■

রাজ্য পরিচিতি

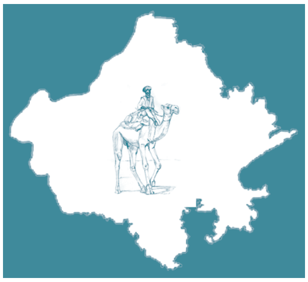

রাজস্থান

শৌর্য বীর্য ও বলিদানের ভূমি রাজস্থান রাজ্য। ভারতের উত্তর- পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। ভারতের একমাত্র মরুভূমি ‘থর’ এই রাজ্যে। রাজস্থানের আয়তন ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ২৩৯ বর্গকিলোমিটার। জনসংখ্যা ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৩২৫ জন। ভাষা হিন্দী ও রাজস্থানী। রাজধানী জয়পুর। পুষ্করতীর্থে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মন্দির অবস্থিত। বল্লভ সম্প্রদায়ে প্রধান তীর্থস্থান নাথদ্বার উদয়পুরের কাছে। রণকাপুর জৈন মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। চিতোরগড়, কুম্ভলগড় ও রণথোম্বর ঐতিহাসিক দুর্গ। আবু পর্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১২২০ মিটার উচ্চে। বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম আছে। মরুভূমির মধ্যে জয়সলমির শহর পর্যটন কেন্দ্র। উদয়পুর শহরে চৈতক স্মারক, হাওয়ামহল, হলদিঘাট, কিশনগড়, প্রতাপগড় প্রভৃতি অন্যতম দর্শনীয় স্থান। স্বাধীনতার পূজারি রাণাপ্রতাপ এবং ভক্তিমতী মীরাবাঈয়ের পবিত্র ভূমি এই রাজ্য।

প্রশ্নবাণ

১.চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায় কার পৌত্র?

২.টিনটিন চরিত্রটি স্রষ্টা কে?

৩.পিরামিড কোন্ দেশে দেখা যায়?

৪.‘মোনালিসা’ চিত্রটি কার আঁকা?

৫.নেপালের রাষ্ট্রপতি কে?

উত্তর : ১. উপেন্দ্রকিশোর ২. হার্জ। ৩. মিশর। ৪. লিও নার্দো দ্য ভিঞ্চি। ৫. বিদ্যাদেবী ভাণ্ডারি।

ছবিতে অমিল খোঁজ

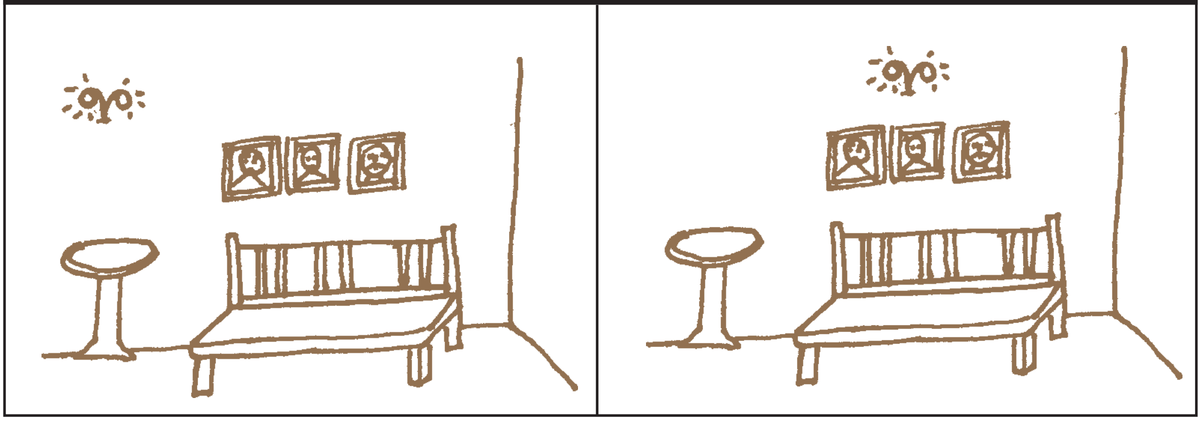

ছোটদের কলমে

ছুটির মজা

মৌমিতা দেবনাথ দ্বিতীয় শ্রেণী, বিরাটী

আজ রবিবার শুধুই মজা
বাড়িতে বসে করব খেলা
সকাল সন্ধ্যে গান ও আঁকা
শুনবো নাকো কারো কথা।

পড়ব না তো একটুকু আজ
খেলা ছাড়া নেই কোনো কাজ,
ধুমধাম করে পুতুল বিয়ে
এই করে দেব দিন কাটিয়ে।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
E-mail : swastika5915@gmail.com

মেল করা যেতে পারে।

খান সাহেবের বিবির আত্মকথন

অনসূয়া চন্দ্র

নমস্কার! আমি খান সাহেবের বিবি বলছি। আপনাদের প্রিয় অভিনেতা কোনো এক খানের স্ত্রী! ম্যানিকিওর করা নখে নেলপালিশ লাগানোর ফাঁকে বারেবারেই চোখ রাখছি আমার এল ই ডি টেলিভিশনের পর্দায়। আপনাদের মনে আছে নিশ্চয়ই যে, কিছুদিন আগে আতঙ্কিত হয়ে আমার স্বামীকে আমার করা সেই প্রশ্নটা, দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে না তো? দাদরি কাণ্ডের পর তথাকথিত অসহিষ্ণুতা ইস্যু নিয়ে গোটা দেশ যখন তোলপাড় সেই সময়ে আমার এই ছোট্ট প্রশ্নটা খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক ছিল কি? ভাবুন তো, এক মুসলমান ভাইয়ের ছোট্ট একটা ভুলের মাশুল তাকে এমনি ভাবে দিতে হবে? এটা তো একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ বলেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বোঝানো হয়েছে। এখানে মুসলমানরা প্রয়োজনে মন্দিরে ঢুকে গোরু কেটে তার রক্ত এখানে ওখানে ছড়িয়ে দিতে পারে! প্রকাশ্য দিবালোকে বুদ্ধিজীবীরা গোমাংস খেয়ে নিজেদের প্রগতিশীল বলে জাহির করে বাহবা নিতে পারে! ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে তো এটাই বোঝায়, তাই না? হিন্দুরা গোমাতার পূজা করলে ভ্যাংচাব আর মসজিদের সামনে কেউ শূকর মাংস ভক্ষণ করলে 'অসহিষ্ণু' বলে জিগির তুলে তাকে উচিত শিক্ষা দিতে যাব— আমি তো ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে এটাই বুঝি।

যাই হোক, টিভিতে দেখছিলাম যে, পাঠানকোটের বায়ুসেনা ঘাঁটি জঙ্গিদের দখলমুক্ত করার জন্য সমানে লড়াই চলছে। ছয় জন জঙ্গি মারা গেছে। খুব খারাপ লাগছে জানেন ওদের পরিবারের কথা ভেবে। ওরাও কারোর না কারোর সন্তান, ভাই, স্বামী অথবা বাবা! সেনা, এন এস জি বা গরুড় বাহিনী কী সেই সব মুখগুলির কথা মনে করে এদের প্রতি এতটুকু ক্ষমা বা করুণা দেখাতে পারেনি! আমাদের মধ্যে থেকে কী সহিষ্ণুতা নামক গুণটা একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? মিডিয়ার একট বড় অংশের আদিখ্যেতাটা শুধু দেখুন। এন এস জি, ডি এস সি আর গরুড় বাহিনীর শহীদের নিয়েই এরা শুধু মাতামাতি করছে!

এন এস জি'র লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিরঞ্জনের দেড় বছরের শিশুকন্যা বিস্ময়া, গরুড় কম্যান্ডোর গুরুসেবক সিং-য়ের মাত্র দেড় মাসের দাম্পত্যের বিধবা স্ত্রী যশপ্রীত অথবা ডি এস সি'র হাবিলদার কুলবন্ত সিং-য়ের পরিবারের কথা ভাবলেই শুধু চলবে। আমাদের দেশের অসহিষ্ণু শাসকদল তো একবারও জঙ্গিদের পরিবারে খোঁজ নিয়ে দেখছে না যে, তাদের বাড়িতে হাঁড়ি চড়েছে কিনা! আমার স্বামীকে 'সত্যমেব জয়তে'র পরবর্তী সিজনে এই জঙ্গি ভাইদের পরিবার নিয়ে একটা বিশেষ পর্ব দেখাবার অনুরোধ করব।

তবে হ্যাঁ, এত অসহিষ্ণুতার মধ্যেও একটু আশার আলো কিন্তু দেখা যাচ্ছে। নির্ভয়া জ্যোতি সিং কাণ্ডের সেই 'নাবালক' অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি। একটি বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রে দেখলাম— ছেলেটি নাকি এখন মৌলবাদী হয়ে উঠেছে। সংশোধনাগারে থাকার সময় সে এক জঙ্গির সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। ছাড়া পাবার পরে আরো কত জ্যোতি তার লালসা ও নৃশংসতার বলি হবে তা জানা নেই। জিহাদের নামে বহু নিরীহ 'কাফের'কে সে পরপারে পাঠাতে পারবে। কিন্তু যেহেতু সে মুসলমান, তাই তাকে চরম দণ্ড দেওয়া যাবে না। ভারত প্রকৃত সহিষ্ণু রাষ্ট্র হবে তখনই যখন মুসলমানদের অত্যাচারের প্রতিরোধ করলে হিন্দুদের গৈরিক সন্ত্রাসবাদী তকমা দেওয়া হবে আর মুসলমানরা দাঙ্গা, হত্যা, ডাকাতি বা নারী নির্যাতন করলে তাকে 'ছোট্ট ভুল' বা 'বিপথগামী' আখ্যা দেওয়া হবে। আরে, হিন্দুর ঘরে জন্মালেও আমি যে এখন খান সাহেবের বিবি! ■

অন্তর্লীন মারণ রোগটিকে বুঝতে হবে

অতিথি কলম

জে এস রাজপুত

দেশের বুদ্ধিজীবীরাই সমাজের মধ্যে থেকে অসহিষ্ণুতাকে দূর করতে পারেন। তাঁরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে নানান জাত ধর্মের মানুষের মধ্যেকার বন্ধনকে শক্তিশালী করতে পারেন। এতে সহজেই সংখ্যালঘু মুসলমানদের কায়েমি স্বার্থ ধ্বংস হতে পারে।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে বিহার নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরস্কার ফেরত দেওয়ার ঘটা ও হুঙ্কার দুম করে বন্ধ হয়ে গেল। অনেকেই হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীদের প্রতিভা আরও নানান সদর্থক দিকে নিয়োজিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ সমাজে রয়েছে। সমাজ তা থেকে উপকৃতও হতে পারে।

প্রসঙ্গত, সাহিত্য আকাডেমি তাদের নিয়ম কানুন ঘেঁটে দেখেছে সেখানে পুরস্কার ফেরত নিয়ে নেওয়ার কোনো রীতি বা পদ্ধতি উল্লেখিত নেই। তারা সেই মর্মে বিক্ষুব্ধ প্রাপকদের অপারগতার কথা জানিয়েও দেয়। হিন্দি সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও সম্মানিত লেখক কাশীনাথ সিং তাঁর ফেরত দেওয়া পুরস্কার পুনরায় গ্রহণ করতে চান। মিডিয়ার সূত্র অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে এই রঙ বদল শুরু হওয়ার কারণ তাঁরা ভাবছেন তাঁদের উদ্দেশ্য সফল করে ফেলেছেন। কী অসাধারণ চাতুর্য! তাহলে সাধারণ নাগরিক হিসেবে এটা ভাবা কী এখন খুব অন্যায় হবে যে যাঁরা পুরস্কার ফেরত পর্বে নেমেছিলেন তাঁরা কর্তব্য সাধিত হয়ে যাওয়ার পর আমাদের এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজে আবার সহিষ্ণুতা ও বৈচিত্র্যের গ্রহণীয়তাকে কোনোরকম রাজনৈতিক বা আদর্শগত বাধ্যবাধকতা ছাড়াই কি পুনঃপ্রচার করবেন। শুধু তাই নয়, সমাজে একাত্মতা ও ধর্মীয় সৌহার্দ্য বজায় রাখতে তাঁরা ভবিষ্যতে কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা রাজনৈতিক দলের প্রতি তাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা বিরক্তি আর সেভাবে প্রকাশ করে আবহাওয়া দূষিত করবেন না। তাঁদের প্রতিটি শব্দচয়ন ও মুখনিঃসৃত বাক্য বিরাট ফারাক সৃষ্টি করে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা কঠিন। তাই অত্যন্ত সংবেদনশীলতার প্রয়োজন।

হতাশাগ্রস্ত প্রভুদের প্ররোচনায় এখন কি কোনো আদর্শগত বিভেদের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করার সময়? অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু ভারতীয় রাজনীতিক চরম বিষাদময় ঘটনাকে নিয়েও নিজেদের রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে ছাড়ছেন না। ব্যাপারটা কয়েকমাস ধরে দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ উদাহরণ হায়দরাবাদের ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা।

দেখে মনে হয় আমির খান একটু দেরিতে হলেও কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। হঠাৎ করে 'অবিশ্বাস্য ভারত'-এর ব্রান্ড প্রতিনিধি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে হওয়া ঘরোয়া সংলাপ সর্বভারতীয় মিডিয়ায় উগরে ফেলে যে হঠকারিতা করেছেন তা নিয়ে আঙুল কামড়াচ্ছেন। সম্প্রতি তাঁর প্রতিক্রিয়া— "তিনি ভারতের সঙ্গে তীব্র আকর্ষণে জড়িত। ১৫ দিনও দেশের বাইরে থাকা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়"। তিনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন— ভারত একটি সহিষ্ণু সমাজ এবং তা যুগ যুগান্ত ধরে। তাই আপামর দেশবাসী ও বিদেশে থিতু ভারতীয়রাও তাঁকে ভালবাসেন এবং ভবিষ্যতেও এর ব্যত্যয় হবে না।

সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা থেকে অবশ্য আমাদের বিশেষ শিক্ষা নেওয়ার আছে। বিশেষ করে তাঁদের যাঁরা যথার্থই সমাজ থেকে সহিষ্ণুতা দূর করার লক্ষ্যে কায়মনোবাক্যে কাজ করে চলেছেন। মনে রাখা দরকার, শুধুমাত্র সহিষ্ণুতার উত্তরাধিকার ও আবহমান কালের সুন্দর সামাজিক প্রথাগুলি আমাদের ওপর অর্শালেও যে কোনো মুহূর্তে তার ওপর আঘাত আসতে পারে। আর এই আঘাত হানতে উদগ্রীব রয়েছে কায়েমি স্বার্থ। তাই বলছি দূরদর্শিতা ও সদা-সজাগ থাকাই হচ্ছে সমাজকে নিরুপদ্রব রাখার মূল সূত্র। এই বিষয়ে শৈথিল্য সমাজের পক্ষে মর্মান্তিক হতে পারে। ভারতে সর্বদাই বিভাজনকেন্দ্রিক প্রবণতা ও নির্দিষ্ট কিছু পকেটে যে অসহিষ্ণুতার অস্তিত্ব রয়েছে সেটিকেই নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে--- সমাজ-

বিরোধীরা শুধু নয়, দেশবিরোধী শক্তিগুলিও।

বলা নিষ্প্রোয়জন নরেন্দ্র দাভোলকর, পানসারে ও কলবর্গির হত্যা জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে দুঃখিত ও লজ্জায় অধোবোধন করেছিল। এখানে রাজনৈতিক বিশ্বাস বা বিশেষ আদর্শবাদী ঝোঁকের কোনো প্রভাব ছিল না। একই কথা উত্তরপ্রদেশে মহম্মদ আখলাখের করুণ মৃত্যুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব তো আমজনতার কথা। কিন্তু এই সমস্তক্ষেত্রে পুরস্কার বিজয়ী বুদ্ধিজীবীদের সঠিক ভূমিকা কী হওয়া উচিত। তাঁরাই পরিস্থিতির শ্রেষ্ঠ বিচারক। কিন্তু প্রশ্ন, আগুন যত ক্ষুদ্রই হোক তার স্ফুলিঙ্গ দেখা গেলেই তাকে নেভানো উচিত, না হাওয়া দিয়ে লেলিহান করা উচিত?

বস্তুত হতাশাগ্রস্ত প্রভুদের প্ররোচনায় এখন কি কোনো আদর্শগত বিভেদের কারণে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করার সময়? অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কিছু কিছু ভারতীয় রাজনীতিক চরম বিষাদময় ঘটনাকে নিয়েও নিজেদের রাজনৈতিক ফয়দা লুটতে ছাড়ছেন না। ব্যাপারটা কয়েকমাস ধরে দেখা যাচ্ছে। সর্বশেষ উদাহরণ হায়দরাবাদের ছাত্র রোহিত ভেমুলার আত্মহত্যা। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পরিচালকরা তাঁদের ছাত্রদের সঙ্গে একটা সৌহার্দ্যমূলক আন্তরিকতা বজায় রাখতে পারলে ছাত্রটি আত্মহননের পথে যেত না।

প্রসঙ্গত, ৬৭তম গণতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রাক্কালে ভারতের ওপর বহির্দেশীয় জঙ্গিদের আচমকা হামলার ভয়ঙ্কর আশঙ্কা ছিল। কিন্তু নিরাপদে এমন একটা বড় মাপের উদ্‌যাপনী অনুষ্ঠান যে সফল ভাবে চালিত হয়েছে তার কৃতিত্ব নিরাপত্তা বাহিনীর প্রাপ্য, অথচ এর কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের ডানকৌর অঞ্চলের একটি স্কুলে কিছু দেশবিরোধী শক্তি জাতীয় পতাকা উত্তোলনে বাধা দেয়। তবে, স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই পতাকা উত্তোলিত হয়। কিন্তু এখানেই তো শেষ নয়। তাদের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেই কি তারা এই ধরনের কুকর্ম থেকে সরে আসবে? এরাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ও হিন্দী পড়ানো বন্ধ করে কেবল উর্দু বহাল করতে চাইছে। দেখে শুনে মনে হয় তারা যে গাছে বসে আছে তারই ডাল কাটতে চাইছে। এই বিশেষ শ্রেণীর কট্টরপন্থীরাই সমগ্র মুসলমান সমাজের সমৃদ্ধি ও প্রগতির পথ আটকে দাঁড়াচ্ছে। তাই সময় হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের হোমরা-চোমরাদের এটা বোঝার যে তাদের জাতভাইরাই তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে অন্তর্ঘাত করে দারিদ্র্য ও অশিক্ষার পথ থেকে বেরোতে দিচ্ছে না। বাস্তবে কেবলমাত্র সরকারকে দোষারোপ করে আর নিজেদেরকে সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে অবহেলার শিকার এখন হতাশায় ডুবে থাকলে কোনো উন্নতিই ঘটবে না।

এ প্রসঙ্গে পুরনো সাহবানু মামলাটি আবার পর্যালোচনার দাবি রাখে। ভারত সরকারকে যারা সংবিধান বদল করতে বাধ্য করে মুসলমান মহিলাদের অধিকার নষ্ট করেছিল তারা কিন্তু প্রান্তিক মুসলমান গোষ্ঠী ছিল না। তারাই ছিল গরিষ্ঠাংশ। গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ আনন্দে উল্লসিত হয়ে মুসলমান বিধবাদের দুর্দশাকে উপভোগ করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট তাদের পেনশন পাওয়ার অধিকার দিলেও এই শ্রেণীই সংবিধান বদল করিয়ে তা কেড়ে নেয়।

অতি সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশ সরকার একটি অতি সদর্থক ভাবনায় উর্দু শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকলে তাকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করে। হায়! যথাযোগ্য ক্ষমতার অলিন্দের চাপে সরকারকে মাথা নোয়াতে হয়েছে। বহু স্ত্রী সংবলিত আবেদনকারীরাও যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন এমন বিজ্ঞপ্তি জারি হয়ে গেছে। এই দুটি উদাহরণ থেকে পরিষ্কার যে আদতে মুসলমান সমাজের ভেতর থেকেই উঠে আসছে পরিবর্তিত সময় ও অগ্রসরমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার অনীহা। সমাজের চিরাচরিত গতিশীলতা যা সভ্যতাকে চিরকাল এগিয়ে নিয়ে গেছে তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখলে যে সমূহ ক্ষতি এটি তারা উপলব্ধি করতে চাইছে না। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এতে শুধু তাদের সমাজের ক্ষতিই সাধিত হচ্ছে না সমগ্র দেশের অগ্রগতিতেও তা বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অসহিষ্ণুতা বাস্তবে কখনই দূর হবে না। যদি না মুসলমান সমাজের এই আত্মঘাতী মানসিকতা দূর করতে বুদ্ধিজীবীরা তাদের প্রয়োজনীয় ভূমিকা না পালন করেন।

(লেখক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন সচিব)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিশেষভবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে যে, সরাসরি ব্যাঙ্ক মারফৎ বা মণিঅর্ডার যোগে স্বস্তিকায় টাকা পাঠালে সেই টাকা কী বাবদ পাঠালেন তা সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তিকা দপ্তরকে জানান। গ্রাহকদের টাকা পাঠালে তাঁদের সম্পূর্ণ নাম ও ঠিকানা (ফোন নং-সহ) পাঠাতে হবে। অন্যথায় নাম না জানার কারণে আপনাদের পাঠানো টাকার কোনো রসিদ কাটা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। যার ফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন গ্রাহকের টাকা পাঠানো সত্ত্বেও যেমন পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না, তেমনই বকেয়া টাকার কারণে কারও কারও পত্রিকা সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচতে আপনাদের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

ইতিমধ্যে আপনি যদি ব্যাঙ্ক মারফৎ স্বস্তিকাতে কোনো টাকা পাঠিয়ে থাকেন তাহলে কবে পাঠিয়েছেন, কত টাকা পাঠিয়েছেন এবং কি বাবদ পাঠিয়েছেন অনুগ্রহ করে সত্বর আমাদের জানান। ব্যাঙ্ক মারফৎ টাকা পাঠালে ব্যাঙ্ক যে রসিদ আপনাকে দেয় সেই রসিদের জেরক্স কপিটা আমাদের পাঠালে ভালো হয়।

— ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

বাঙালির দুর্দিন—ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ

প্রবাল চক্রবর্তী

বাঙালি হিসেবে বাংলার কোন পরম্পরায় আমি সবচেয়ে বেশি গর্বিত? সঙ্গীত? চিত্রকলা? সাহিত্য? ভাস্কর্য? নাটক? চলচ্চিত্র? বাংলার অধ্যাত্মবাদ ছিল বাংলার বিপ্লবী চেতনা। বিবেকানন্দ ও সুভাষ, অধ্যাত্মবাদ ও বিপ্লবী চেতনা, দুইয়ের সংশ্রিণেই আদর্শ বাঙালি। এই দুটো কিন্তু আবার একে অপরের পরিপূরক। বিপ্লবী চেতনা বিনে আধ্যাত্মবাদ হয় বন্ধ্যা। অধ্যাত্মবাদ বিনে বিপ্লবী চেতনা হয়ে পড়ে অন্ধ, দিক্‌হারা। বাঙালির যাবতীয় গর্বের, যাবতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উৎসমূলে রয়েছে বাংলার 'বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদ', তার 'প্র্যাকটিকাল বেদান্ত'। বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদ ছাড়া বাঙালি আর বাঙালি থাকে না। যবে থেকে বাঙালি তার রেভল্যুশনারি স্পিরিচুয়ালিজমকে ভুলেছে, হতাশা নেমে এসেছে তার জীবনে।

ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছিল ১৯০৮ সালে। তার ঠিক তিন বছর পর ইংরেজরা রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কাকতালীয় নয়। স্টেটসম্যানে সেদিন লেখা হয়েছিল, 'বৃটিশরা কবরের শহরে যাচ্ছে, কবরস্থ হতে'। সেটা তারা জানতো। তবু বৃটিশ সরকার কতকটা নিরুপায় হয়েই রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেছিল। ক্ষুদিরাম ফাঁসির দড়িকে ভয় পায়নি। বলেছিল, আমি গীতা পড়েছি। আমার মৃত্যু নেই, আমি আবার ফিরে আসবো। এই একটা কথাই ইংরেজ সাম্রাজ্যের হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল। ভারতের এক শতাংশ কিশোর-তরুণও যদি ক্ষুদিরাম হয়ে ওঠে, তবে কী গতি হবে তাদের সাম্রাজ্যের? রাজধানী স্থানান্তরিত করেও ইংরেজ সরকার শান্তিতে বসতে পারেনি। ভূমি-উদ্‌গত, আনন্দমঠ- গর্ভজাত বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদকে ধ্বংস করার মাস্টার-প্ল্যান তৈরি হয়েছিল তখনই। বিপ্লবীদের কোণঠাসা করতে বাংলার গ্রামে সরকারি পেটোয়া মিলিশিয়া তৈরি হয়েছিল। বঙ্গীয় আইনসভায় কারচুপি করে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেওয়া হয়েছিল। এরইসঙ্গে দুই বিজাতীয় ধারার অনুপ্রবেশ ঘটল স্বাধীনতা সংগ্রামে। মার্কসবাদ আর গান্ধীবাদী অহিংসাবাদের সাঁড়াশি-আক্রমণে বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদ হলো কোণঠাসা। এর মধ্যে মার্কসবাদের বাংলায় অনুপ্রবেশের কাহিনি গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। বাংলার বিপ্লবীদের ধ্বংস করার চূড়ান্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির তদানীন্তন গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডারসনকে। এই সেই জন অ্যান্ডারসন, দার্জিলিংয়ে বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্যের গুলি যাঁর শরীর ছুঁয়ে গেছিল। সেদিন থেকেই তিনি চরম ভারত-বিদ্বেষী, বিশেষ করে বাঙালি-বিদ্বেষী। অসম্ভব ধূর্ত ছিলেন এই অ্যান্ডারসন সাহেব। বাঙালির বুলেটের বদলে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের বাক্সবন্দী করে পাঠাতে শুরু করলেন দিস্তা দিস্তা কমিউনিস্ট ইস্তাহার। তার কয়েক বাক্স সেই সুদূর আন্দামানেও পৌঁছেছিল। যাদের প্রতিদিন বই না পড়লে ঘুম হয় না, তাদের যদি সলিটারি কন্‌ফাইনমেন্টে মাসের পর মাস বছরের পর বছর সভ্যজগৎ থেকে নির্বাসিত করে রাখা হয়, তবে তাদের কী অবস্থা হবে, অনুমান করা কঠিন নয়। বন্দী বিপ্লবীদের তখন এমন অবস্থা, একটা ঠোঙা পেলেও তা তাঁরা খুলে পড়ে ফেলেন। সেই সময় কমিউনিস্ট ইস্তাহার তাঁদের কাছে সম্মোহক আফিমের রূপে এসে পড়ল। গরিবদের ভালো করতে হবে, তাদের কল্যাণে নিয়োজিত সরকার তৈরি করতে হবে। ওপর ওপর এসব কথা তো নিঃসন্দেহে ভালো লাগে। চিনির মোড়কে কী যে বিষ গেলানো হচ্ছে, সেটা বোঝাবার আগেই সে আফিম-বিষ গোগ্রাসে গিলে দেশপ্রেমী বিপ্লবীদের একটা বড় অংশ হয়ে গেল আন্তর্জাতিকতাবাদী। আন্তর্জাতিকতা -বাদের সূত্র ধরে ঢুকে পড়ল দেশদ্রোহিতা, আত্মঘাতী চিন্তাবিকৃতি। যে বিপ্লবীরা সে পথ নিলেন না, তাঁরা এক এক করে খুন বা নির্বাসিত হলেন। শুধু একজনকে ওরা মারতে বা দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারেনি। সেই মহাবিপ্লবী অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে ইম্ফলে পৌঁছলেন স্বাধীন বাহিনী নিয়ে। বৃটিশ-ইন্ডিয়ান আর্মি বিদ্রোহী হলো, ভারত স্বাধীন হলো। দুর্ভাগ্যের বিষয়, বিপ্লবীদের অনুপস্থিতিতে বাংলায় তখন দুটোই পক্ষ—গান্ধীবীদী কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা। খণ্ডিত বাংলা দ্বিতীয় জারজ ধারার নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ল। অ্যান্ডারসনের স্বপ্ন সার্থক হলো।

কালে দিনে আরো মজার ঘটনা দেখল ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি। এক কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে হলো শত টুকরো। এক কংগ্রেসও ভেঙে হলো অনেক টুকরো। যত দিন গেছে, বাহ্যিকভাবে স্ফীত হলেও গান্ধীবাদ ও মার্কসবাদ ক্রমশ জীবনীশক্তিহীন হয়ে পড়েছে। তাদের ধারক-বাহকদের আরো

বেশি করে নির্ভর হতে হয়েছে রাজশক্তি আর লুম্পেন পেশীশক্তির ওপর। এ বোধহয় কালের এক অমোঘ নিয়ম। অধর্মের পক্ষ যত বলশালীই হোক না কেন, তারা চিরদিনই ক্রমক্ষীয়মান। ছল-চাতুরি ও গুণ্ডামিই তাদের অন্তিম আশ্রয়।

আমার দিদিমা ছিলেন জমিদারের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, কোনো দুঃখী মানুষ তাঁর দুয়ার থেকে খালি হাতে ফিরতো না। আমার মা-মাসি'রা ছাত্রীজীবনে তথাকথিত বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। মাসি অঙ্কে তুখোড় ছিলেন। অঙ্ক, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন—তিনটেতেই পেয়েছিলেন লেটার মার্কস। সেই মাসিকে পার্টি নির্দেশ দিয়েছিল— পরীক্ষা না দিয়ে একই ক্লাসে বছরের পর বছর থেকে যেতে। যাতে তাঁর মাধ্যমে মহাবিদ্যালয়ে ছাত্র-রাজনীতির ভিত মজবুত হয়। মা'রও কতকটা সেরকমই দশা হয়েছিল। তাঁর খটকা লেগেছিল একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। পার্টির এক নেতা একদিন তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি বিপ্লবের জন্য প্রয়োজন হয়, তবে পারবি, তোর মা, ওই বুর্জোয়া মহিলাটাকে গুলি চালিয়ে মেরে ফেলতে?' মা'র স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল সেদিন। এরকম আরো অনেক ঘটনা শুনেছি মা'র কাছে। পার্টি করা আর না-করা কাউকে ভালোবেসে ফেললে তা হয়ে পড়ত গর্হিত অপরাধ। পার্টির নির্দেশ না মানলে চরম মানসিক নিপীড়নের শিকার হতে হোত। একটি পরিবারের অসুস্থ বাবা প্রতিদিন কর্পোরেশনের কল থেকে জল ভরে আনতেন, আর সেই জলে আগেভাগে স্নান করে বাড়ির বড় মেয়ে বেরিয়ে যেত পার্টির কাজ করতে। একদিন ছোটো মেয়ে প্রতিবাদ করল। পার্টির নেতারা হামলে পড়ল তার ওপর, সে কেন 'বুর্জোয়া বাবা-মা'র সমর্থনে দাঁড়াচ্ছে, এই অপরাধে। ধ্বংসাত্মক রাজনীতির প্রভাবে সামাজিক বন্ধনগুলো ধ্বংস হয়ে গেল।

রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা, যাদের ওপর ছিল নতুন বাংলা গড়ার ভার, তারা লেখাপড়া ছেড়ে রাজনীতি নিয়ে মেতে রইল। সেরা ছাত্রছাত্রীদের একটা বিরাট অংশ অতি-বাম রাজনীতির পথে হেঁটে চীনের চাউমিন বানাতে গিয়ে খুন হয়ে গেল। পাড়ার মোড়ে- মোড়ে ভ্রাতৃঘাতী খুনজখম হয়ে পড়ল নিত্যদিনের ঘটনা। বাঙালির ইন্টেলেক্ট বাঁধা পড়ল লুম্পেন পেশীশক্তির হাতে। দায়িত্বজ্ঞানহীন জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন রাজনীতির অত্যাচারে কলকারখানা আর অফিসগুলো পালিয়ে গেল ভারতের অন্যান্য প্রান্তে। একে একে বাঙালি মালিকানার চা-বাগানগুলো লকআউট হলো, দেউলিয়া হয়ে গেল। আর সেই 'বিপ্লব'-এ মদত যুগিয়ে মোটা হলো জঙ্গি ট্রেড-ইউনিয়ন নেতাদের পেট। টেরি-বাগানো সর্বহারার মহান নেতার ছেলে বিস্কুট বেচে লন্ডনে হোটেল খুললো। বাঙালি হলো সর্বহারা। কেউ কেউ বিদেশে বা অন্য রাজ্যে পালিয়ে বাঁচলো।

অদ্ভুত ভণ্ডামি এই কমরেডদের। এরা নিত্যদিন প্যালেস্টাইন নিয়ে গলা ফাটায়, অথচ ঘরের দোরগোড়ায় সিন্ধি আর বালুচদের গণহত্যায়, বাংলাদেশের হিন্দুদের নির্যাতনে এরা নির্বিকার। এই ভণ্ডামি এরা শিখিয়ে দিয়েছে বাঙালিকে, ষোলো আনার জায়গায় আঠারো আনা।

এই ভণ্ড বামপন্থীরা বাংলার বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদ থেকে অধ্যাত্মবাদকে বাদ দিয়ে বিপ্লবীর মুখোশটুকু শুধু নিয়েছিল। বাংলার অধিকাংশ তরুণ-তরুণীকে বোকা বানিয়েছিল সেই মুখোশটা। ওই তথাকথিত বামপন্থীরা চেয়েছিল, ভারতীয় সমাজটাকে ধ্বংস করে চীন-রাশিয়ার ধাঁচে নতুন করে গড়ে তুলতে। সেই রাস্তায় চলে আমাদের প্রতিটি শ্রদ্ধার কেন্দ্রকে ওরা করে তুলেছে অশ্রদ্ধার পাত্র। তাই আজ আর শ্রদ্ধা করার মতো কিছু নেই বাঙালির কাছে। কয়েকটা প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গেল এইভাবে। চরিত্রবলহীন, আত্মসর্বস্ব এক বাঙালির আবির্ভাব হলো। এ এমন এক বাঙালি, যে নিজের শিবকে চেনে না। নিজের গলায় নিজেই ছুরি চালায়। নিজের অবিমৃশ্যকারিতায় নিজের রাজ্যের কলকারখানাগুলোকে তাড়িয়ে অন্য রাজ্যে পাঠিয়ে দেয়। মাস্তানি, চিটফান্ড, চিটিংবাজি আর তোলাবাজি-শিল্পে দেশের অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করে নেয়। যেচে অনুপ্রবেশকারী জেহাদিদের ডেকে আনে সীমান্তের ওপার থেকে। গত চল্লিশ বছরে বাংলায় গরিব মানুষের ক্ষমতায়ন হয়নি, হয়েছে জেহাদি আর লুম্পেনদের ক্ষমতায়ন। তাদের হাতেই চলে গেছে বাংলার চলচ্চিত্র, সাহিত্য, রাজনীতি— সবকিছু। এই আত্মঘাতী বাঙালিকে কীভাবে আবার প্র্যাকটিকাল বেদান্তর বাঙালিতে রূপান্তরিত করা যায়? শ্রদ্ধার প্রতিটি স্তম্ভই তো আজ ভূলুণ্ঠিত। কোন জিনিসটা আঁকড়ে ধরে বাঙালি উঠে দাঁড়াবে? বাংলার বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদকে তো আমরা নিজেরাই গলা টিপে হত্যা করেছি, তথাকথিত বামপন্থার নেশায় ভুলে। আজ তাকে কীভাবে ফিরিয়ে আনবো? আজকের চ্যালেঞ্জ সেটাই।

ধরুন, একটা জঙ্গলে এক অনন্যসাধারণ প্রজাতির উদ্ভিদ আছে। অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারায় সে ভেষজ। একদিন দাবানলে পুরো জঙ্গলটাই পুড়ে

ছাই হয়ে গেল। এদিকে ঔষধির অভাবে অসুখে মরছে মানুষ। এমন সময় জানতে পারলেন, আগুন লাগার অনেক আগেই এক বৈদ্য ওই ঔষধি-বৃক্ষের একটা চারা এই জঙ্গল থেকে নিয়ে গিয়ে পাশের জঙ্গলে রোপণ করেছিল। সেই চারা এখন পাশের জঙ্গল ছেয়ে ফেলেছে। কী করবেন তখন? নিশ্চয়ই পাশের জঙ্গল থেকে সেই গাছের একটা চারা নিয়ে এসে পুড়ে যাওয়া জঙ্গলে পুঁতবেন, তাই না? নতুন করে সজীব করে তুলবেন ভস্মীভূত জঙ্গলটাকে?

কৃষ্ণের বেড়ে ওঠার কথা ছিল মথুরায়। কিন্তু কংগ্রেসের অত্যাচারে মথুরায় তখন বিভীষিকার রাজত্ব। কৃষ্ণের বাবা বসুদেব তাই সদ্যোজাত কৃষ্ণকে গোপভূমিতে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু নন্দর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গোপভূমির সহজ-সরল পরিবেশে কৃষ্ণ ধীরেসুস্থে বড় হলেন। হয়ে উঠলেন সেই মহামানব, যা হওয়ার জন্য তাঁর জন্ম। আমাদের অজান্তে বাংলার বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদও রক্ষা পেয়েছে কতকটা সেইভাবেই।

ছাত্রজীবনে স্বাধীনতা-আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে রাস্টিকেট হয়েছিল কেশব। নাগপুর ছেড়ে তাই কলকাতায় এসেছিল ডাক্তারি পড়তে। পড়া শেষ হলে নাগপুরে ফিরে আবার স্বাধীনতা-আন্দোলনে যোগ দিল। একদিন হঠাৎ সেসব ছেড়ে গুটিকয় বালক-কিশোরকে নিয়ে মাঠে খেলাধুলা শুরু করল। বন্ধুরা বলল, পাগল! কেশব বলেছিল, তোরা তোদের কাজ চালিয়ে যা। আমি একটা মৌলিক কাজ করব স্থির করেছি। এ দেশ যে কারণে পরাধীন হয়েছিল, সেই কারণটাকে নির্মূল করব। দেশ জুড়ে আমি একটা দেশভক্ত তৈরির কারখানা পত্তন করব। শুনে সবাই হেসেছিল, বিদ্রূপ করেছিল। সে বিদ্রূপে কান না দিয়ে কেশব নিজের স্থিরীকৃত পথে স্থির লক্ষ্যে এগিয়েছিল। তারই পরিণতি দেশজোড়া এক সংগঠন--- রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। দেশজোড়া একটা সংগঠন, যার কোনো সদস্যপদ নেই, কোনো চাঁদা নেই। যে শাখায় যায়, সেই 'স্বয়ংসেবক', তাকে নিয়েই সংগঠন। কোনো অফিসিয়াল অ্যাটাচমেন্ট নয়, শুধু ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট। ভারতবর্ষের মূল সমস্যা আমাদের মধ্যেকার অনৈক্য। কেশব বলেছিলেন, ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব,

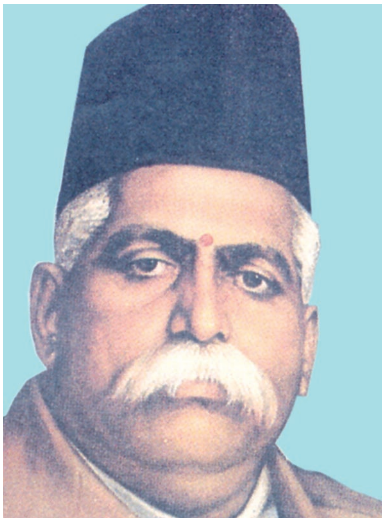

দেশপ্রেম--- এগুলো একটা অভ্যাস। শাখার মাধ্যমে সেই অভ্যাসটা তিনি জাতির মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। এ যেন এক মুক্ত অনানুষ্ঠানিক বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর সেরা ম্যানেজমেন্ট ইন্সটিটিউটগুলোর তুল্য সংগঠন-বিদ্যা শেখায় এই সংগঠন, বিনামূল্যে।

কেশব হেডগেওয়ার বাংলার বিপ্লবী সংগঠনে অনুশীলন দলের সদস্য ছিলেন। তাঁর অকাল-মৃত্যুর পর যিনি দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সেই মাধব গোলওয়ালকর ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দর শিষ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ-পরম্পরায় আত্মশ্রাদ্ধ করে সন্ন্যাসী হওয়ার পরেও কর্তব্যের টান তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল নাগপুরে। আন্দাজ করা কষ্টের নয়, আর এস এসের সঙ্গে বাংলার নাড়ির টান কতটা গভীর। পরম্পরাগতভাবে আর এস এস বঙ্গ-চেতনার ধাঁচেই গড়া। বাংলাতেই তার জন্ম হতে পারতো। কিন্তু মহাকাল জানতেন, বাংলায় কী দাবানল আসতে চলেছে। কেশব বাংলার বিপ্লবী-চেতনার ধারক, মাধব বাংলার অধ্যাত্ম-চেতনার বাহক। মহাকালের ইশারাতেই আর এস এসের অঙ্কুরকে, বাংলার বিপ্লবী অধ্যাত্মবাধকে, কেশব-মাধব বাংলা থেকে নিয়ে গেলেন মহারাষ্ট্রে, লালন-পালন করে বড় করে

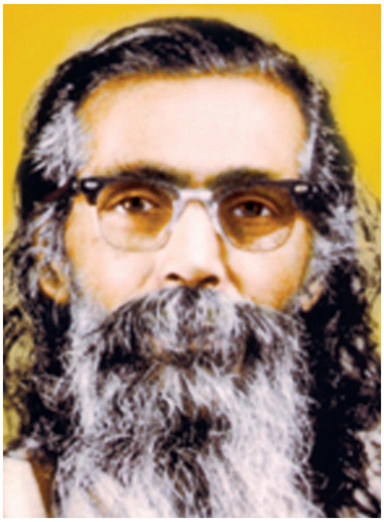

তুললেন সেখানে। অনুকূল পরিবেশে সে অঙ্কুর পল্লবিত হয়ে আজ মহীরুহ হয়েছে। বিপ্লবী চেতনার নিরিখে মহারাষ্ট্র তো বাংলার ভ্রাতৃপ্রতিম, যেমন বসুদেব আর নন্দ। স্বাধীনতার যুদ্ধে দুজনেই ছিল ব্রাদার-অ্যাট-আর্মস। এর বাসুদেব ফাড়কে তো ওর ক্ষুদিরাম বোস, এর বিনায়ক সাভারকর তো ওর সুভাস বোস, এর বালগঙ্গাধর তিলক তো ওর বিপিচন্দ্র পাল। দুঃখের কথা, গোপভূমি থেকে কৃষ্ণ যখন মথুরায় ফিরেছিলেন, মথুরাবাসীর তাঁকে চিনতে কষ্ট হয়নি; অথচ আর এস এসকে অধিকাংশ বাঙালি চেনার চেষ্টা করেনি, উপেক্ষা আর বিরোধিতাই শুধু দিয়েছে।

অনুশীলন দলের কার্যপদ্ধতির মূলে ছিল আখড়া বা ব্যায়ামশালা। গ্রাম-শহরের বিভিন্ন ব্যায়ামশালায় মিলিত হোত সদস্যরা। ডাম্বেল-মুগুর ভেঁজে, কুস্তি আর বক্সিং করে নিজেদের শারীরিকভাবে তৈরি

করতো দেশসেবার জন্য। ব্যায়াম শেষে মহামানবদের জীবনী পাঠ হোত, দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা হোত। যার মাধ্যমে তৈরি হোত ভাবী বিপ্লবীদের মন। ঠিক সেই পদ্ধতিটাই নিয়েছিলেন কেশব। স্থায়ী কোনো আখড়া নয়, যেকোনো খেলার মাঠে স্বয়ংসেবকরা দিনের একটা সময়ে মিলিত হয়। ব্যায়াম করে, মার্শাল আর্টের চর্চা করে। মনীষীদের জীবনী পাঠ করে, দেশের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে। দেশাত্মবোধক গান গায়। এর মাধ্যমেই চরিত্র নির্মাণ হয়। এটাকেই 'শাখা' বলে। অনুশীলন দলের কার্যপদ্ধতি থেকে কেশব আরেকটা জিনিসও নিয়েছিলেন। কেশব দেখেছিলেন, অনুশীলন দলের সদস্যদের মধ্যে প্রগাঢ় ভ্রাতৃত্ব আর ভালবাসা। একে অপরের জন্য ওরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে। আর সেটাই ছিল অনুশীলন দলের সাংগঠনিক চালিকশক্তি। কেশব আর এস এসের ক্ষেত্রেও স্বয়ংসেবকদের পারস্পরিক স্নেহকেই সংগঠনের চালকশক্তি হিসেবে মেনেছিলেন।

আজকের এই তমসাচ্ছন্ন পরিস্থিতি থেকে বাঙালি কি কোনোদিনও মুক্তি পাবে? ভবিষ্যৎ পূর্বনির্ধারিত নয়। আমাদের আজকের পদক্ষেপ নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ কী হবে। বৃহৎ, পরিবর্তন-সক্ষম ও সমাজকল্যাণে নিয়োজিত লোকসংগঠন সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে বাঙালির পুনরভ্যুত্থানের চাবিকাঠি। এমন সংগঠন, যা মনুষ্যনির্মাণের কারখানা রূপে সমাজের প্রত্যন্ত অংশেও সাবলীলভাবে কাজ করতে পারে। বাংলার পরিত্রাণের পথ রয়েছে বাংলায় বিপ্লবী অধ্যাত্মবাদের পুনরুজ্জীবনে, আর এস এসের কার্যপদ্ধতির মননে। যদি আপনি বাংলাকে এই দুর্দশা থেকে উদ্ধার করতে চান, কেশব হেডগেওয়ারের কার্যপদ্ধতি থেকে আপনি নিশ্চয়ই অনুপ্রেরণা পেতে পারেন। তাঁর মনুষ্যনির্মাণের পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে পারেন। আজ বাংলার যা পরিস্থিতি, তা থেকে বেরিয়ে আসতে প্রয়োজন বাংলায় আরেকটা নবজাগরণের। যেকোনো নবজাগরণের চালিকাশক্তি শুধুমাত্র মানুষ। আমাদের নবজাগরণের পথে বাধা, মানুষের অভাব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, মানুষ চাই, মানুষ থাকলে আর সব হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ তো আর আকাশ থেকে পড়বে না। কাউকে তো এই মনুষ্যনির্মাণের কাজটা করতে হবে। রাজনীতি দিয়ে এ সমস্যার সমাধান হবে না। রাজনীতি মনুষ্যনির্মাণ করে না। একটা সময় ছিল, যখন গুরুকুলে মনুষ্যনির্মাণ হোত। গুরুকুল ধ্বংস হলো, সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল যৌথ পরিবার ও শিক্ষকরা। আজ যৌথ পরিবারও অতীত। বিগতদিনের যেসব শিক্ষকরা সর্বস্ব ত্যাগ করে ছাত্রনির্মাণ করতেন, আজ তাঁরাও আর নেই। আজকের শিক্ষকরা বেশিরভাগই 'টিউশন-মাস্টার'। ছাত্রদের চরিত্রনির্মাণ নয়, তাদের ভালো মার্কস পাইয়ে দিয়ে টু-পাইস কামিয়ে নেওয়াই তাঁদের জীবনের ব্রত। এ নিয়ে হা-হুতাশ করে, কাউকে দোষারোপ করে লাভ নেই। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্য কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে মনুষ্যনির্মাণের এই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। সমাজের চিকিৎসা তো সমাজকেই করতে হবে। আপনি যেরকম শিক্ষক, যেরকম বিডিও, সরকারি অফিসার, যেরকম মন্ত্রী-সান্ত্রী বাস্তবে দেখতে চান, সেরকম মানুষ তো আপনাকেই তৈরি করতে হবে। ডাঃ কেশব হেডগেওয়ারের উপলব্ধি বাংলাকে নতুন করে গড়ে তোলার রাস্তায় পাথেয় হতে পারে। সমাজে যদি ঘুণ ধরে থাকে, তবে তার চিকিৎসা যেখানে ঘুণ ধরেছে, সেখানেই করতে হবে। কোনো 'শর্টকাট' নেই এখানে। যে প্রজন্ম অবক্ষয়িত, তাকে নিয়ে নতুন করে কিছু করা সম্ভব নয়। আজ যারা বালক-কিশোর, তাদেরকে দিয়েই আগামী যুগের বাংলার পুনর্নির্মাণ করতে হবে। যেকোনো বড় কাজের আরম্ভ ছোটো ছোটো কাজ দিয়েই হয়। আর সে কাজে আমরা সবাই হাত লাগাতে পারি। আমাদের আশেপাশে কত কিশোর-কিশোরী বড়দের মনোযোগের অভাবে বিপথে চলে যাচ্ছে। তাদের বাবা-মা চাকরি নিয়ে ব্যস্ত, ছেলে-মেয়ে মানুষ করার সময় তাঁদের নেই। একটু স্নেহ, একটু প্রেরণা আর মহৎ আদর্শের সন্ধান পেলে তারা আগামী দিনের দেশভক্ত সুনাগরিক হয়ে উঠবে। তাদের হাতেই হবে বাংলার পুনর্নির্মাণ।

(লেখক মেলবোর্ন প্রবাসী ভারতীয়)

উজ্জয়িনী পূর্ণকুম্ভ এবং হরিদ্বার অর্ধকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল:-

অমৃতকুম্ভমেলার কথা

— লালঠাকুর

(হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক, উজ্জয়িনী একত্রে)

মূল্য : ২২০ টাকা মাত্র

প্রকাশক : জাগরী পাবলিকেশন প্রা. লি.
কলেজ স্কোয়ার ইস্ট, ব্লক-৪, স্টল নং -৩৩, কলিকাতা-৭৩

প্রাপ্তিস্থান : চেতনা বুক স্টল, আরামবাগ (গৌরহাটীর মোড়) হুগলী

যোগাযোগ : বিমল মুখোপাধ্যায়, মো:- ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮, ৮৩৪৮৮০৬১৫৩

কয়েদিদের জন্য সফট্ওয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। অর্থাৎ যাঁর যেটা কাজ তিনি যেখানেই থাকুন না কেন কাজটা করেই যান। এরকমই একজন অমিত কুমার মিশ্র। কয়েদি হওয়ার কারণে জেলের ভিতরে বসেই তৈরি করে ফেলেছেন একটি ওয়েবসাইট। যে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কারাগারে বন্দীদের খুঁটিনাটি তথ্য রাখা অনেক সহজ হয়েছে।

পেশায় সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অমিত জেলে বসেই উপলব্ধি করেন বন্দীদের তথ্যে অনেকরকম ফাঁকফোকর রয়ে গিয়েছে। এমনকী বিভিন্ন নিয়ম নীতির মধ্যেও গলদ

জেলে থেকেই কয়েদিদের জন্য সফট্ওয়ার তৈরি করেছেন অমিত।

রয়েছে। তাই এই ব্যবস্থা বদলাতে তৎপর হন। তাঁর কথায়, আমার পুলিশি হেফাজত হয়ে যাওয়ার পর বুঝতেই পারতাম না কবে আদালতে যেতে হবে। বা কেসের বর্তমান অবস্থান কী। কিছুই জানা যেত না। এক্ষেত্রে শুধু আমি নয় জেলের সমস্ত কয়েদিরই এই অবস্থা। অর্থাৎ ধন্দে থাকা জেল কয়েদিদের এই অবস্থা থেকে মুক্তি দিতে উদ্যোগী হন তিনি। জেলেই বসেই শুরু করেন কয়েদিদের তথ্য রাখার ওয়েবসাইট। যে ওয়েবসাইট খুলে স্থান এবং থানার নাম দিলেই সেখানে উপস্থিত কয়েদিদের ব্যাপারে জানা যাবে। নাম-ধাম এবং কী কারণে বন্দী এ যেমন জানা যাবে তেমনই সেই ব্যক্তির মামলা কোন জায়গায় অবস্থান করছে সে ব্যাপারেও জানা যাবে। ফোলিক্স এবং কিয়স্ক সফটওয়ারের মাধ্যমে এই পুরো সিস্টেমটি চলছে। আর প্রত্যেক কয়েদির আঙুলের ছাপ নিয়ে এই সিস্টেমে থাকা প্রত্যেকের আলাদা আলাদা তথ্য রাখা আছে। প্রত্যেক কয়েদির নামে যে আলাদা আলাদা ধারা আছে সেই সমস্ত ধারারও উল্লেখ থাকবে বলে জানা যায়। এমনকী আদালতে পরবর্তী কোন দিনে মামলা উঠবে সে ব্যাপারেও জানা যাবে। এক্ষেত্রে জেলে কর্তৃপক্ষ যেমন সহজেই এ বিষয়ে অবগত থাকতে পারবে তেমনই কয়েদিরাও পারবে। এসবের পাশাপাশি অমিত মিশ্র দাবি করেন জেলের মধ্যে কুপন বিলিতেও রয়েছে বিস্তর গোলমাল। কারণ জেল কর্তৃপক্ষ কুপন দেয় কয়েদিদের। যা দেখিয়ে কারাগারের ক্যান্টিন থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। কিন্তু সেই কুপন বণ্টনেও যেমন ভুল হয় তেমনই কুপনে লেখা পুরো নম্বরটিও অস্পষ্ট। ফলে ক্যান্টিন কর্তৃপক্ষ অনেক সময় সেই কুপনের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে অস্বীকার করেন। এক্ষেত্রে অমিত নতুন কুপনের ডিজাইন করে দিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষকে। যা দেখে খুশি জেল কর্তৃপক্ষ এবং কয়েদিরাও। বর্তমানে এই কারাগার সম্পর্কিত ওয়েবসাইট হরিয়ানার সমস্ত থানার সমস্ত কয়েদিদের জানা। জেল সুপারটেনডেন্ট থেকে কারাগার মন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই খুশি এরকম একটি সফট্ওয়ার পেয়ে। ইতিমধ্যে হরিয়ানা হাইকোর্ট থেকে সেই ওয়েবসাইট স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

দিল্লীর গুরগাঁওয়ের বাসিন্দা অমিত মিশ্র ২০১২ সালে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হন। বেশ সুখেই সংসার করছিলেন সফটওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অমিত। পিএইচপি কাজে দক্ষ অমিত মিশ্রর জীবনে নেমে আসে এক অন্ধকার। তাঁর স্ত্রী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যা করার কারণ আজও জানেন না তিনি। কিন্তু তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির অভিযোগ তাদের মেয়েকে হত্যা করেছে জামাই নিজেই। আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। অমিতবাবুর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪বি, ৪৯৮এ, ৩৪ নম্বর ধারা প্রয়োগ করা হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হন। শুরু হয় কারাগার জীবন। শ্রী মিশ্র বলেন, যে শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে নিজের ছেলের মতো মনে করতেন তারাই আবার আমায় জেলে পাঠালেন। তাঁরা যেমন নিজের মেয়েকে হারিয়েছেন আমিও তেমন আমার স্ত্রীকে হারিয়েছি।

শাস্তির মেয়াদ শেষ হলে মুক্তি পান তিনি। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি সবকিছু ভুলে সামনের দিকে এগোতে চান। তবে আজও তিনি জানেন না যে কী কারণে তাঁর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছিলেন। বর্তমানে গুরগাঁওয়ের ডি এল এফ ফেজ II তাঁর ঠিকানা হলেও তিনি থাকেন ভোন্দসি জেল ক্যাম্পাসের সরকারি আবাসনে। সেখানেই তিনি কারগার প্রযুক্তিকরণের জন্য কোম্পানি খুলেছেন।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

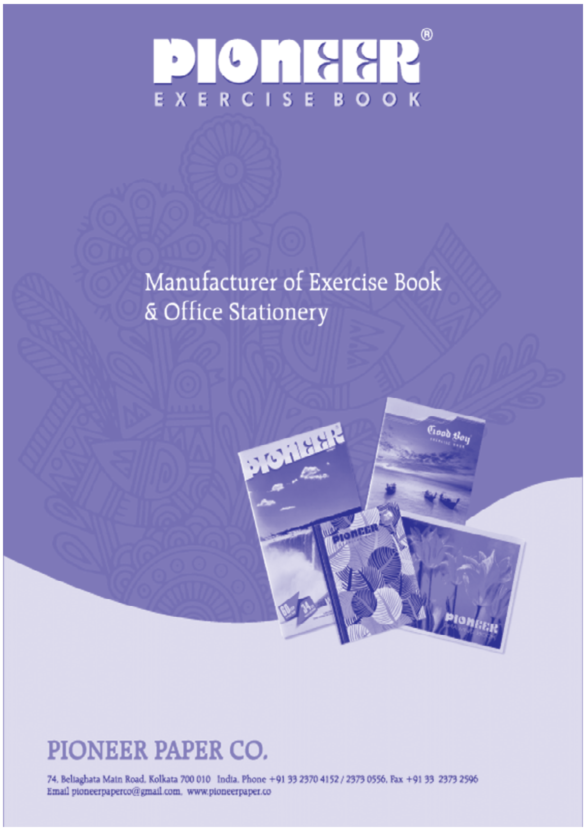

‘ আজকের দিনে ভারতের শিক্ষা শুধু জাতীয়ভাবে হলেই হবে না, জাতি গঠনকারীও হতে হবে। জাতীয় ভাবের অর্থ সর্বোপরি অপরের জন্য অনুভব। এর দৃঢ়ভিত্তি গণচেতনা ও তীব্র নাগরিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আমাদের শিশুদের মন স্বজাতি ও স্বদেশের চিন্তায় পূর্ণ রাখতে হবে। এজন্য নিজ পরিবারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বাইরে রাখতে হবে তাদের চিন্তার ভারকেন্দ্র।’

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের উদ্যোগে পণ্ডিত দীনদয়াল ব্যাখ্যানমালা

বক্তব্য রাখছেন ড. মহেশ শর্মা,

''পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় আত্মপ্রসিদ্ধির অন্তরালে থাকতেন। তাঁর কথা ছিল— 'কাজ দেখ, কার্যকর্তাকে নয়'। দেশকে সঠিক পথে চালানোয় দীনদয়ালজীর ভাবনা যেখানে যেখানে পৌঁছেছে তার নাম একাত্ম মানবদর্শন। ব্যক্তি বনাম সমাজের বিতর্কে ভারতীয় পরম্পরাকে মনে রেখে তাঁর ঘোষণা— ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পরবিরোধী নয়; একাত্ম। এজন্য সঠিক অর্থে ভারতীয় ঐতিহ্যের একজন শক্তিশালী বাহক পণ্ডিত দীনদয়াল''— কলকাতায় আয়োজিত ব্যাখ্যানমালায় কথাগুলি বলেন নয়াদিল্লীর একাত্ম মানবদর্শন গবেষণা সংস্থার সভাপতি ড. মহেশচন্দ্র শর্মা।

কলাকাতায় অসোয়াল ভবনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ অতিকথনের কারণে একপেশে ও প্রতিক্রিয়াশীল। এর বিপরীতে দীনদয়ালজী ভারতীয় জীবনদৃষ্টির ভিত্তিতে একাত্ম মানবদর্শন বিকশিত করেছেন। তিনি ব্যষ্টি, সমষ্টি ও পরমেষ্টির পারস্পরিক একাত্মতাকে ব্যক্ত করেছেন। দেশ গঠনের জন্য সুন্দর এক সূত্র দিয়েছেন— স্বদেশিকে যুগানুকূল এবং বিদেশিকে দেশানুকূল করা প্রয়োজন।''

প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন লখনউয়ের মেয়র তথা ভারতীয় জনতাপার্টির সহ-সভাপতি ড. দীনেশ শর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ সাংবাদিক রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পুস্তকালয়ের উপদেষ্টা প্রবীণ আইনজীবী যুগলকিশোর জৈথলিয়া। অনুষ্ঠানে কলকাতা ও হাওড়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিতি ছিলেন।

সারা বাংলা যোগাসন প্রতিযোগিতায় রানার্স কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে কলকাতার বালিগঞ্জে রবিবার আয়োজিত হয় সারা বাংলা যোগাসন চ্যাম্পিয়ানশিপ-২০১৬। এই প্রতিযোগিতায় সারা রাজ্যের কুড়িটি জেলার প্রায় পাঁচ শতাধিক প্রতিযোগী অংশ নেয়। ৮-১৪ বছরের বালিকা বিভাগের কাঁথির অনুপ্রভা দাস প্রথম স্থান এবং চন্দশ্রী সাহু দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে। এরপর মোট ৮টি বিভাগের প্রথম স্থানাধিকারিণীদের নিয়ে হয় চ্যাম্পিয়ান অফ চ্যাম্পিয়ান প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়ে কাঁথির গৌরব বৃদ্ধি করে অনুপ্রভা দাস। তাকে ইন্ডিয়ান যোগ ফেডারেশনের সভাপতি নীরেন চক্রবর্তী, ওয়ার্ল্ড যোগ সোসাইটির কর্ণধার ডাঃ দিব্যসুন্দর দাস প্রমুখ যোগীন্দ্র ব্যায়ামাচার্য বিষ্ণুচরণ ঘোষ স্মৃতিতে সুদৃশ্য ট্রফি এবং নগদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করেন। এরা আঠিলাগড়ি যোগ কালচার অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রী। এদের এই সাফল্যে অভিনন্দন জানিয়েছেন হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ড. ছন্দা শাসমল, যোগ কালচার অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য প্রশিক্ষক সুকুমার প্রধান, সভাপতি গৌরহরি গিরি, সম্পাদক রঞ্জন জানা, সিদ্ধার্থ শাসমল, জয়দীপ ঘোড়াই প্রমুখ। যোগ কালচার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই দুই প্রতিভাকে আগামী দিনে সংবর্ধনা জানানো হবে বলে জানানো হয়েছে।

বাঁকুড়ায় অর্শ চিকিৎসা শিবির

গত ১২ ফেব্রুয়ারি বাঁকুড়া শহরের পাঞ্চজন্য ভবনে সমাজ সেবা ভারতীর উদ্যোগে এক অর্শ চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট অর্শ চিকিৎসক ডাঃ বি সি সাহা ২৩ জন রোগীর চিকিৎসা করেন। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া সেবা ভারতীর সম্পাদক মোহন চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বিদ্যুৎ দত্ত, জেলা সেবা প্রমুখ শিশির গঙ্গোপাধ্যায়, বিভাগ প্রচারক আশিস পাল, জেলা প্রচারক সৃজন হাজরা, কার্যালয় প্রমুখ গোপাল ঠাকুর প্রমুখ।

আরোগ্য ভারতীর স্বাস্থ্য শিবির

গত ৭ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত আরোগ্য ভারতীর উদ্যোগে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগরের বেলেডাঙ্গায়। প্রথমে গ্রামবাসীদের সামনে স্বাস্থ্য সচেতনা বিষয়ে বক্তব্য রাখা হয়। তাতে বিনা ওষুধে সুস্থ থাকা, মধুমেহ থেকে মুক্ত থাকা, জীবনশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হয়। শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা করেন ডাঃ শম্ভুনাথ ধাড়া, ডাঃ অনির্বাণ ঘোষ, ডাঃ পার্থ চৌধুরী, ডাঃ জয়দের মাহাতো প্রমুখ। ১৫৭ জন গ্রামবাসীর চিকিৎসা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আরোগ্য ভারতীর বারুইপুর শাখার সহ-সভাপতি প্রকাশচন্দ্র প্রামাণিক, জেলা সদস্য মিতা মণ্ডল ও সাংবাদিক কেয়া ঘোষ।

শোকসংবাদ

মালদা জেলার চাঁচলের বিশিষ্ট সমাজ সেবক তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শুভানুধ্যায়ী শঙ্করলাল আগরওয়াল গত ৩০ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ২ কন্যা রেখে গেছেন। হিন্দু জনজাগরণের

কাজে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতেন। চাঁচল বিবেকানন্দ শিশুমন্দিরের 'সারদা কক্ষ'টি তাঁর সহৃদয় অনুদানেই নির্মিত হয়েছে। তাঁর কনিষ্ঠপুত্র দীনেশ আগরওয়াল প্রথমবর্ষ শিক্ষিত স্বয়ংসেবক।

ঝাড়গ্রামে সমাজ সেবা ভারতীর ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের পরিচালনায় ঝাড়গ্রাম জেলায় ভারতীয় ভাবধারার প্রতি শ্রদ্ধা জাগানো ও আত্মনির্ভর সমাজ তৈরির লক্ষ্যে ১৮টি সংস্কারকেন্দ্র প্রত্যন্ত গ্রামে চালানো হয়। ওই সমস্ত কেন্দ্রের ভাই, বোন, দিদিভাই ও অভিভাবকদের নিয়ে গত ৩১ জানুয়ারি প্রথম বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঝাড়গ্রাম শহরের ননীবাবা বিদ্যালয় (বয়েজ)-এর মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৩টি কেন্দ্রের মোট প্রতিযোগী ছিল ১১৫ জন। অভিভাবক ও পরিচালকমণ্ডলী-সহ মোট উপস্থিতি ছিল ২২৫ জন। পূর্ণ সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন ওই দিনের সভাপতি, ঝাড়গ্রাম শহরের স্বনামধন্য চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুরজিৎ চৌধুরী। বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী ও শিল্পপতি অভিষেক যাদব। উপস্থিত ছিলেন সমাজ সেবা ভারতীর প্রাদেশিক সহ-সভাপতি, বিভাগীয় প্রধান, কৃষি ও খাদ্য প্রযুক্তি বিভাগ, আই আই টি খড়্গপুরের প্রফেসর বীরেন্দ্র কুমার তেওয়ারী ও সহ-সম্পাদিকা মুনমুন ঘোষ, বিউটি বোস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবী পিউ গিরি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত টোলীর সদস্য রাজকুমার ঝা। পূর্ণ সময় থেকে খেলা পরিচালনা

করেন অলিম্পিয়ান ও ক্রীড়া ভারতীর সদস্যা ইলা দত্ত। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মোট ১৫টি বিভাগের ১১৫ জন প্রতিযোগীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের সভাপতি-সহ অন্যান্য প্রতিনিধি। ১৫টি বিভাগের খেলায় ১১৫ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণ ও মাঠের খেলোয়াড় সুলভ আচরণ এলাকাবাসীর মনকে প্রভাবিত করে।

উত্তরবঙ্গে সংস্কৃত ভারতীর সম্ভাষণ শিবির

গত ১ থেকে ১০ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে মাধব ভবনে সংস্কৃত ভারতীর উদ্যোগে ১০ দিনের সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে বিভিন্ন স্তরের ৩০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন। উদ্বোধনী ও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ি নগরের সংস্কৃত ভারতীর সংযোজক ব্যাঙ্ক কর্মচারী, ও অবসরপ্রাপ্ত বায়ুসৈনিক টুলরাজ গৌতম পথনির্দেশ করেন। শিবির সঞ্চালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃত ভারতীর উত্তরবঙ্গ সংগঠন সম্পাদক সমীরণ মাজী। উল্লেখ্য, গত নভেম্বর মাসে কোচবিহারে এবং মালদায় এরকম শিবির হয়। কোচবিহার রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ সম্পূর্ণ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সিকিমে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের চিন্তন বৈঠক

গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সিকিম উপপ্রান্তের দু'দিনের চিন্তন বৈঠক হয় সিকিমের রানিপুল কল্যাণ আশ্রমে। বৈঠকে পথনির্দেশ করেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি জীবেশ্বর মিশ্র, কেন্দ্রীয় সৎসঙ্গ প্রমুখ বসন্ত রথ, ভি. কে. এ-র কেন্দ্রীয় সহ সম্পর্ক প্রমুখ রাধাকৃষ্ণজী, উত্তরবঙ্গের সংগঠন সম্পাদক গৌতম সরকার। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিকিম উপপ্রান্তের সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার সি পি গিরি, সম্পাদক ডাঃ এম এম ধাকল। বৈঠকে মোট ৪৫ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কোটিপতি হোন!

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফাণ্ডে SIP করুন

১০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ৩২ লাখ টাকা।

যোগাযোগ ঃ দেবাশিষ দীর্ঘাঙ্গী, শুভাশিষ দীর্ঘাঙ্গী

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

9830372090
9433359382

মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

শোক সংবাদ

হাওড়া জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উলুবেড়িয়া মহকুমার ব্যবস্থা প্রমুখ সৌমেন মণ্ডলের বাবা শিশির কুমার মণ্ডল গত ১১ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের স্বাস্থ্য শিবির

পূর্বাঞ্চল কল্যাণ আশ্রমের পরিচালনায় গত ৩ থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণবঙ্গের ৭টি জেলায় ২৪টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনাখালি, চড়পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, সুন্দরবন এলাকার গোসাবা দ্বীপের ৮নং পরশমণি, দয়াপুর ফ্লাডসেন্টার, মন্মথনগর ভবেন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়, বড়মোল্লাখালি মধ্যতারানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়, চুনাখালি আদিবাসী ল্যাম্পস লিমিটেড। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ ব্লকের কাটিনমোড়, রাউতোড়া কল্যাণ আশ্রম, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলপাহাড়ি কল্যাণ আশ্রম, গোপীবল্লভপুর ব্লকের বাবুডুংরু উচ্চবিদ্যালয়, নয়াগ্রাম কোটসাই প্রাথমিক বিদ্যালয়, কেশিয়ারী ব্লকের কুকাই প্রাথমিক বিদ্যালয়, পুরুলিয়া জেলার ঝালদা ব্লকের হেসাআতু প্রাথমিক বিদ্যালয়, খোটাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়, আরসা ব্লকের আরসা শিশুমন্দির, কেন্দা থানার কুরংকতোপা আশ্রম, মানবাজার ব্লক-২ এর কুমারী কল্যাণ আশ্রম, বান্দোয়ান ব্লকের রাজাউলি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বীরভূম জেলার রামপুরহাট ব্লক-১এ ভাটিনা জুনিয়ার স্কুল, সালবাদরা নিরিশা প্রাথমিক বিদ্যালয়, জেঠিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান জেলার আউসগ্রাম থানার মল্লিকপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাঁকাসা থানার আমানিতাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্ধমান সদর থানার নাদুর ঝাপানতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়। ২৪টি শিবিরে মোট ৬৫৯৪ জন বিভিন্ন ধরনের রোগীকে চিকিৎসা করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও যাদের চক্ষু অপারেশনের দরকার আছে তাদের কলকাতায় এনে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে। যে সমস্ত চোখের রোগীর চশমার প্রয়োজন হয়েছে তাদের স্বল্প মূল্যে চশমা দেওয়া হবে। নাগপুর হতে আগত ৬ জন, লন্ডন হতে আগত ৫ জন এবং কলকাতার ১৮ জন ডাক্তারবাবু শিবিরগুলিতে চিকিৎসা করেন। ন্যাশনাল মেডিকোস অরগানাইজেশন শিবির পরিচালনার জন্য সহযোগিতা করে।

জাতীয়তাবাদী বাংলা
সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০ টাকা
প্রতি কপি ১০্ টাকা

গ্রাহক হোন
গ্রাহক করুন

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় স্মরণে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্প্রতি লোকান্তরিত হলেন বর্ষীয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। পরিণত বয়সের মৃত্যু, কিন্তু সেই সঙ্গে হারিয়ে গেলেন গত শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে একটি দীর্ঘসময়ের বাঙালি জীবনের একান্ত স্বকীয়তাগুলিকে অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে চলচ্চিত্রে অমর করে রাখার চেষ্টায় নিয়ত এক মরমি মানুষ। ব্যক্তিগত জীবনে প্রখ্যাত ডাক্তার সাহিত্যিক বনফুলের তিনি কনিষ্ঠ ছিলেন। চিকিৎসা নয় চলচ্চিত্রের রুপালি জগৎ তাঁকে টেনে নেয় চল্লিশের দশকের শেষে। সহ-পরিচালক হিসেবে হাত পাকাতে লাগলেন তখনকার নিউ থিয়েটার্সের প্রখ্যাত পরিচালক বিমল রায়ের কাছে। শিক্ষার হাতেখড়ি পাকা লোকের কাছে হওয়ার প্রমাণ তাঁর প্রথম ছবি 'কিছুক্ষণ'-এর (১৯৫৯) রাষ্ট্রপতি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন।

অরবিন্দবাবু কখনই দেশ-বিদেশে কিছু পুরস্কার পেয়েই আত্মতৃপ্ত হওয়া ঘরানার পরিচালক ছিলেন না। তিনি পৌঁছতে চেয়েছিলেন সাধারণ চলচ্চিত্র দর্শকদের হৃদয়ে। অরবিন্দবাবুর প্রতিভার প্রকৃত স্ফুরণ শুরু হয় ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া উত্তম-সাবিত্রী অভিনীত নিশিপদ্ম ছবি থেকে। বরাবরের সাহিত্যরসিক অরবিন্দবাবু ছবিটি করেছিলেন বিভূতিভূষণের 'হিংয়ের কচুরি' অবলম্বনে। এ প্রসঙ্গে বলি অতি স্বল্পালোচিত কিন্তু বিপুল প্রতিভাধর সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি 'জাগরী' অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ই দেশ পত্রিকায় নিয়ে গিয়েছিলেন। দেশ কর্তৃপক্ষ তখন বইটি মনোনীত না করায় অরবিন্দবাবু খুবই হতাশ হন। পরবর্তীকালে বইটি ইতিহাস সৃষ্টি করে। যাই হোক নিশিপদ্ম সুপার হিট হয়। এখানে উত্তমকুমারের চিরাচরিত নায়ক-ভূমিকা ভেঙ্গে পরিচালক তাঁকে দোষে-গুণে এক হৃদয়বান বয়স্ক চরিত্র হিসেবেই সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একই সঙ্গে সমাজে এঁটে থাকা ভালোমানুষি, ভণ্ডামির মুখোশ অবলীলায় উন্মোচিত করেন তিনি। মনে পড়ে টিকিধারী, কপালে তিলককাটা পূজারি ব্রাহ্মণের ভূমিকায় নৃপতি চ্যাটার্জীর নামাবলীর অন্দরে মদের বোতল নিয়ে নিষিদ্ধপল্লীতে মুখ ঢেকে যাতায়াত। অন্যদিকে অকপট উত্তমকুমারের সে অঞ্চলেরই এক ভাগ্যবিড়ম্বিত নারীর প্রতি অকৃত্রিম মমত্ববোধ। কিন্তু পরিহাসপ্রিয় অরবিন্দ সমাজব্যাধি চিহ্নিত করতে গুরুগম্ভীর রাস্তা না ধরে উপভোগ্য সংলাপের জালে ছবিটিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেন। চিরস্মরণীয় হয়ে যায়— 'না না আজ রাতে আর যাত্রা শুনতে যাব না' গানটি। এই হাস্যরসের ফল্গুধারা তীব্র স্রোত পায় ১৯৭১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ধন্যি মেয়ে' ছবিতে। বাংলা সিনেমায় অবিতর্কিতভাবে এটিই সর্বকালের সেরা হাসির ছবি। ছবিতে অরবিন্দবাবু তুলে আনেন হাওড়া জেলার বড়গাছিয়া অঞ্চলে একটি বাস্তবের প্রত্যন্ত গ্রামকে। কোনো সেটে তৈরি নয়। চমৎকার একান্ত নিজস্ব ঝকমকে কৌতুকে কী সব নামাঙ্কন করেন— হাড়ভাঙ্গা গ্রাম, ন্যাংটেশ্বর স্মৃতি শিল্ড। নায়ক-নায়িকার নাম মনসা-বগলা। তিনি প্রথম দেখান শ্যাম লাহা অভিনীত গুরুজীর ফুটবল পুজো। আজকাল খুঁটি পুজো করতে স্টার লাগে। ফুটবল পাগল বাঙালির মনের সুলুক সন্ধান করে গান বাঁধেন 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল'। নচিকেতা ঘোষের সুরে মান্না দে এটিকে কালজয়ী করেছিলেন।

অরবিন্দবাবু বাঙালি চরিত্রের পরিহাসপ্রিয়তার নাড়ী চিনতেন। মনে করুন ধন্যি মেয়ের প্রথমেই গোবরবেশী জহর রায় সম্পূর্ণ কেশহীন ভাই গণেশের চুল আঁচড়ানোকে বিদ্রূপ করছেন। 'কি টাক সাজাচ্ছো'। পরবর্তীকালে কথাটি তুমুল জনপ্রিয় হয়। আবার বাড়ির কর্তা উত্তমকুমারকে দেখলেই বৃদ্ধা রাঁধুনী একহাত ঘোমটা দিয়ে সরে যাচ্ছেন। এগুলি বাঙালির অবলুপ্ত একটি সময়ের অভ্রান্ত আচরণ চিহ্ন। এর বিপরীতেই এক ন্যায়নিষ্ঠ একরোখা ডাক্তারের চরিত্র নিয়ে করলেন অগ্নীশ্বর (১৯৭৫)। গল্পটি ছিল বহু সত্য ঘটনার সমাহারে তাঁরই দাদার লিখিত। উত্তমকুমার ও অরবিন্দবাবুর সার্থক যুগলবন্দীতে এমন একটি নির্মল চলচ্চিত্র সৃষ্টি হয় যা বহুকাল সিনেমা না দেখা প্রবীণ দর্শকরাও দেখে ধন্য ধন্য করেন। এখন সচারচর ঘটে না, পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, যে দৃশ্যে স্ত্রীকে দাহ করে অগ্নিশ্বর একটু দেরিতে সভায় পৌঁচ্ছেন তা অতীতের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা তিনকড়ি চক্রবর্তীর তাঁর একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে নিয়মমাফিক অভিনয়ে যোগ দেওয়ার ঘটনার অনুসরণেই নির্মিত। উত্তমকুমারকে অরবিন্দবাবুই বিচিত্র চরিত্রাভিনেতা বানান। শুধুই বুদ্ধিবৃত্তির অনুসারী না হয়ে অরবিন্দবাবু বরাবর হৃদয়বৃত্তির ওপর জোর দিয়েছেন। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ব্যঙ্গের ছলে মর্মান্তিক ছবি এঁকেছেন 'মৌচাক' ছবিতে। শারীরিকভাবে একটু অসামঞ্জস্য গঠনের দুর্গাদাস ব্যানার্জীকে (নায়ক দুর্গাদাস নন) দিয়ে তুমুল রসসিক্ত দৃশ্য তৈরি করেছেন।

অববিন্দবাবুর আর একটি দিক না বললে কিছুই বলা হবে না। তিনি আমৃত্যু ছিলেন চলচ্চিত্র নির্মাণের নেপথ্য কলাকুশলীদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। তিনি সিনেমার নেপথ্য শিল্পীদের জীবনের বাস্তব পরিস্থিতি নিয়ে 'নকল সোনার' মতো একটি প্রায় পরীক্ষামূলক ছবি করেন। চলচ্চিত্রের বহু খ্যাতনামাই (উত্তমকুমার সমেত) এই ছবিতে কোনো পারিশ্রমিক নেননি। নতুন শিল্পীদের হতাশ না হয়ে ধৈর্য ধরার অনুরোধ করে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে ছবিতে একটি গান গেয়েছিলেন। কী অমানুষিক পরিশ্রম করে লাইটম্যান থেকে ট্রলি বয়, সিন অ্যারেঞ্জার থেকে মেকআপ আর্টিস্ট একটি ছবিকে সফল করতে প্রাণপাত করেন তাই সর্বপ্রথম বাংলা সিনেমায় এই ছবিতে পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থাপিত করেন পরিচালক। ছবিতে Stuntman- এর করুণ মৃত্যু হয়। সহজ বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের সঙ্গে কলাকুশলীরাও এক অভিভাবককে হারাল। অরবিন্দবাবুকে প্রণাম। ■

শব্দরূপ-৭৭৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

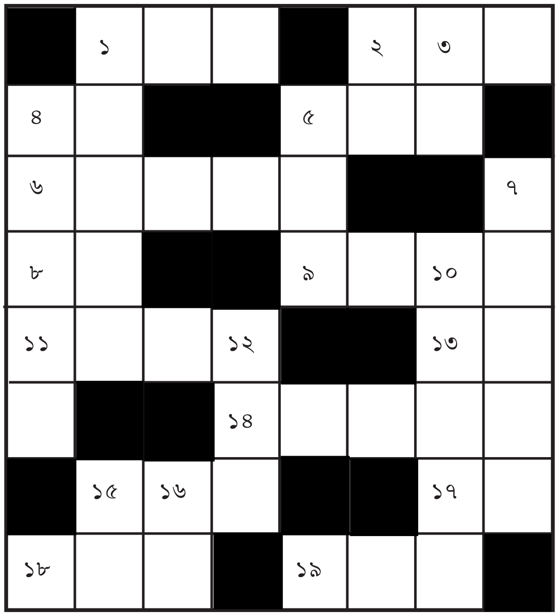

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বলদের কাঁধে যে কাষ্ঠ থাকে, **২.** সাবধান, **৪.** চাকার পাখি, ব্যাসার্ধ, **৫.** শান্তনুর পিতা, ভীষ্মের পিতামহ, **৬.** কার্য সম্পন্ন বা সফল হওয়া, **৮.** নিম্নদেশ, **৯.** ফড়িং-জাতীয় পতঙ্গবিশেষ যারা সদলে এসে শস্য নিঃশেষ করে, **১১.** অগ্নি, তাপ, **১৪.** বশবর্তী, অনুগত, **১৫.** যুদ্ধ, **১৭.** সমূহ, সম্প্রদায়, **১৮.** 'আমি তখন ছিলেম — ঘুমের ঘোরে/যখন বৃষ্টি নামল', **১৯.** কুম্ভকার।

উপর-নীচ : **১.** সত্বর হাজির হওয়ার জন্য কড়া হুকুম, **২.** দক্ষকন্যা, ভগবতী, **৩.** আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কঠিন সাধনা, তপস্যা, **৪.** অবিবাহিত, **৫.** পরাক্রম, প্রভাব, **৭.** বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত কামান, **১০.** পট পরিবর্তন, **১২.** হোম, **১৫.** ধ্যান, সাধনা, চিত্তবৃত্তিনিরোধ, **১৬.** 'রাজার হস্ত করে সমস্ত গরিবের — চুরি'; বিত্ত, সম্পদ।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৭৬

					অ	ধ	ম
	খ	দ্যো	ত		দ্বৈ		র্ক
আ			ম	জু	ত		ট
ল	গ	ন	সা				বৈ
মা				মা	ছি	মা	রা
ল		চ	র	ক			গ্য
গো		তু		না	স্তি	ক	
ত্র	স	র					

সঠিক উত্তরদাতা

বিজয় বসাক
বৈষ্ণবনগর, মালদা
সুজয় হালদার
গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

- ৭৭৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ মার্চ ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

- ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।
- যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।
- ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।
- পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।
- গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।
- স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।
- লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
- রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
- লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

।। চিত্রকথা ।। বিক্রমাদিত্য ।। ১৭

উলুবেড়িয়ায় সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধের ফতোয়া বা পূজানুষ্ঠান ভণ্ড করে দেওয়ার অভিযোগ প্রায় শোনা যায়। এবারেও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত বাসুদেবপুর রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি সরস্বতী পূজার দিন সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। ওইদিন বিদ্যালয় চত্বরে বহিরাগত ছ'জনের একটি দুষ্কৃতী দল বিদ্যালয়ে আগত ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে অশালীন অঙ্গভঙ্গি ও কটূক্তি করতে থাকে। ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করলে গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। এরই মধ্যে একজন দুষ্কৃতী প্রতিমার দু' হাতের আঙুল, পা ও নাক ভেঙে দিয়ে পালানোর সময় উত্তেজনা চরমে ওঠে। গ্রামবাসীরা এই দলের দু'জনকে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুরো ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

বালক স্বয়ংসেবকের কীর্তি

সংবাদদাতা॥ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সোনারপুর অযোধ্যা শাখার বালক স্বয়ংসেবক প্রমিত দত্ত সোনারপুর জ্যোতি শিশু বিহার বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র। সম্প্রতি সে 'সফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিকস্ অলিম্পিয়াড' পরীক্ষায় বিশ্বে ৯৬ তম স্থান অধিকার করেছে। ভারতে তার স্থান ৬৩ তম। স্কুল র‍্যাঙ্কে প্রথম।

সরস্বতী পূজা বন্ধের অনুরোধ বামপন্থী সংগঠনের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সরস্বতী পূজাকে বে-আইনি ও অসংবিধানিক আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পূজা বন্ধ করার অনুরোধ করে সরস্বতী পূজার আগে চিঠি পাঠিয়েছিল বামপন্থী সংগঠন ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি। সংবিধানের ৫১-এ ধারাকে হাতিয়ার করে 'বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারে এগিয়ে' আসার লক্ষ্যে পূজা বন্ধের অনুরোধ করে এই সমিতি। এর সপক্ষে এই সংগঠনটি যুক্তি দিয়েছে, যেহেতু 'সংবিধানগত ভাবে ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র' এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বা উচ্চশিক্ষা সংসদের নির্দেশিকাতে সরস্বতী পূজা করার কোনো উল্লেখ নেই, তাই এই পূজা আইন বিরুদ্ধ। পুরুলিয়া জেলার ডি আই প্রাইমারি স্কুল ও সেকেন্ডারি স্কুলে পাঠানো এই চিঠি সোশ্যাল মিডিয়ার ফাঁস হয়ে যাওয়ার পর তা নিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়।

ভারতীয় নারী বাহিনীর প্রসংশায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ লাইবেরিয়ায় মহিলাদের সুরক্ষা ও নানা সেবাকাজে যুক্ত ভারতীয় নারী সুরক্ষা বাহিনীর কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রসংশা করলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব বান কি মুন। তিনি বলেন— ভারতীয় নারী বাহিনীর কর্মকুশলতা নারী সুরক্ষায় একটি নতুন পথের দিশা দেখিয়েছে,

বান কি মুন

যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের কাছে প্রেরণার। উল্লেখ্য, গত নয় বছর ধরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তি বাহিনীর সঙ্গে একযোগে কাজ করে আসছে ১২৫ জনের এই ভারতীয় দলটি। সম্প্রতি তারা তাদের কার্যকালের মেয়াদ সম্পন্ন করে দেশে ফিরছে।

লাইবেরিয়ায় মহিলাদের উপর যৌন শোষণ, লিঙ্গ বৈষম্য ও বিভিন্ন অপরাধ দূর করার বিষয়ে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছে তারা এবং এই সময়ের মধ্যে সেখানকার সরকার ও সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতেও সক্ষম হয়েছে। তাদের এই কাজ রাষ্ট্রসঙ্ঘের কর্মসূচিতে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে বলে উল্লেখ করেন বান কি মুন।

এছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাজে ভারতের এই সহযোগিতারও প্রশংসা করেন তিনি।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
22 February - 2016 - Rs. 10.00